সূচিপত্র

ক্র. নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভাইভা প্রস্তুতি ও আদব কায়দা	০১
বাংলাদেশ বিষয়াবলি		
০২	সাম্প্রতিক বাংলাদেশ	০৫
০৩	বাংলাদেশ পরিচিতি	২৪
০৪	বাংলাদেশের ইতিহাস	২৯
০৫	পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ	৪০
০৬	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	৪৮
০৭	সংবিধান	৬৯
০৮	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা	১২২
০৯	বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচলিত আইনসমূহ	১৩০
১০	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১৪৩
১১	গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ	১৭৮
১২	বাংলাদেশের ম্যাপ পরিচিতি	১৮৭
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি		
১৩	সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক	১৯৮
১৪	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২১৯
১৫	আন্তর্জাতিক সংগঠন ও জোট	২৩৯
১৬	বৈশ্বিক সংকট ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক	২৫৮
১৭	অর্থনীতি ও প্রযুক্তি	২৯৮
১৮	পরিবেশ	৩০৯
১৯	আন্তর্জাতিক ম্যাপ পরিচিতি	৩১৯

ভাইভা প্রস্তুতি ও আদব কায়দা

ভাইভা প্রস্তুতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) এর ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষায় সর্বশেষ ধাপ হলো ভাইভা পরীক্ষা। মূলত একজন পরীক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই ভাইভা বা মৌখিক পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা শুরু করা উচিত। কারণ, বিসিএস পরীক্ষার তিনটি ধাপের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে বা ভাইভা বোর্ডের সামনে কোনো আচরণগত ত্রুটির কারণে ভাইভাতে অকৃতকার্য হলে প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার জন্য করা সব কষ্ট ও পরিশ্রমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

প্রাথমিক প্রস্তুতি

বিসিএস ভাইভার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস নেই। কিন্তু বিগত বিসিএসগুলোর ভাইভার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কমন টপিক পাওয়া যায় যেগুলো থেকে বিসিএস ভাইভাতে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়। এই টপিকগুলোর মধ্যে কয়েকটি আছে যেগুলোর জন্য লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই একজন প্রার্থী প্রস্তুতি নিতে শুরু করতে পারেন। সেগুলো হলো:

- **১৯৪৭-১৯৭১:** একজন বিসিএস ক্যাডার প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার পূর্ববর্তী ধাপ (১৯৪৭-১৯৭০), বাঙালির সালভিত্তিক আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে পরিচিত রাজনীতিবিদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। পাশাপাশি পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর, ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সাহিত্যাবলিও ভালোভাবে পড়তে হবে। এছাড়া প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়গুলো রিভাইজ দেওয়ার পাশাপাশি কিছু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তরও প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে। যেমন: ১৯৭১ সালে কি মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো না কি স্বাধীনতা যুদ্ধ?, মুজিবনগর সরকারকে কেন প্রবাসী সরকার বলা হয়? ইত্যাদি।
- **নিজ ক্যাডার সম্পর্কে:** প্রত্যেক প্রার্থীর নিজ নিজ ক্যাডার চয়েজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। ধারাবাহিক ভাবে নিজের ক্যাডার চয়েজ লিস্ট বলার অভ্যাস করতে হবে। ক্যাডার চয়েজ লিস্টের প্রথম ৫টি ক্যাডার সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। কোনো ক্যাডার সম্পর্কে পড়ার ক্ষেত্রে সেই ক্যাডারের পদসোপান, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ, কেন সেই ক্যাডারে যোগ দিতে চান – এসব বিষয়ে জোর দিতে হবে। সাধারণত চয়েজ লিস্টের প্রথমে থাকা ক্যাডার থেকেই বেশি প্রশ্ন করা হয়। তাই প্রথম ক্যাডার বিষয়ে খুঁটিনাটি বিস্তারিত জেনে যেতে হবে। সাধারণত পররাষ্ট্র, প্রশাসন, পুলিশ, কর, হিসাব ও নিরীক্ষা – এই ক্যাডারগুলোই প্রার্থীদের চয়েজ লিস্টের শুরুতে থাকে। এসকল ক্যাডার সার্ভিস সম্পর্কে ভালোভাবে পড়তে হবে।
- **নিজ সম্পর্কে জানা:** বিসিএস ভাইভাসহ যেকোনো চাকরির ভাইভা পরীক্ষায় প্রার্থীর নিজের সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক। একজন প্রার্থী যেসব বিষয় সম্পর্কে জেনে যাবেন:
  - নিজ সম্পর্কে ৫-৬ লাইনে গুছিয়ে বাংলায় ও ইংরেজিতে বলার অভ্যাস করা।
  - নিজের নামের অর্থ, একই নামে বিখ্যাত ব্যক্তি থাকলে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে।
  - নিজ পরিবার, আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে ভালোভাবে বলতে পারা। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কেউ মুক্তিযোদ্ধা থাকলে তার সম্পর্কে জেনে যেতে হবে।
  - নিজ জেলা, থানা ও গ্রাম সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে হবে-
    - ডিসি, ইউএনও, ইউপি চেয়ারম্যান, এসপি মহোদয় প্রভৃতির নাম।
    - এলাকার বিখ্যাত ও কুখ্যাত ব্যক্তিবর্গ।
    - নিজ এলাকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাগণ, গণহত্যা, বধ্যভূমি ইত্যাদি।
    - নিজ এলাকার দর্শনীয় স্থান, ঐতিহ্য, লোকশিল্প বা উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান থাকলে সেগুলো সম্পর্কে।
  - নিজের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যেসকল হলে ছিলেন সেগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে।
  - নিজের কোনো শখ বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ থাকলে সেগুলো নিয়ে কিছু বলার প্রস্তুতি থাকতে হবে।
- **নিজ পঠিত বিষয় সম্পর্কে জানা:** স্নাতক পর্যায়ে নিজ পঠিত বিষয় সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান রাখা প্রত্যেক ভাইভা প্রার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজ বিষয় থেকে করা প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে ভাইভা বোর্ড বিরক্ত হতে পারেন। তাই সাধারণ বা পেশাগত যে ক্যাডারই হোক না কেন, নিজের পঠিত বিষয় সম্পর্কে একটা গোছানো প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। এছাড়াও কোথাও কর্মরত থাকলে নিজ কর্মস্থল, পেশাগত দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে প্রশ্ন করা হয়। অতএব, এগুলো সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

- **বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি:** বিসিএস প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসে থাকা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির সাধারণ তথ্যগুলো ভালোভাবে ঝালাই করে যেতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধান, সরকার ব্যবস্থা, ভূ-প্রকৃতি, নদনদী, ইতিহাস ঐতিহ্য, বাংলা সাহিত্য, ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা, ভাস্কর্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, সম্মেলন, চলমান বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির কারণ ও ফলাফল, বিশ্বের বিখ্যাত ও আলোচিত অঞ্চল ও ব্যক্তিসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে গেলে উপকৃত হওয়া যাবে।
- **ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও শখ:** অনেক সময় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, প্রিয় লেখক, শখ, সাম্প্রতিক পড়া বই, দেখা চলচ্চিত্র বা ইন্টারনেটে সার্চকৃত বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। তাই এসব বিষয়ে প্রস্তুতি রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

পরীক্ষার আগের প্রস্তুতি

বিসিএস ভাইভার প্রস্তুতির জন্য কিছু বিষয় পরীক্ষার আগে দেখে যেতে হয়। সেগুলো হলো:

১। যেদিন ভাইভা সেদিন বাংলা ও আরবি ক্যালেন্ডারে কত তারিখ, সেদিন বা তার কাছাকাছি কোনো বিশেষ দিবস আছে কিনা, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিন থাকলে সে সম্পর্কে জেনে যেতে হবে।

২। ভাইভা পরীক্ষার আগের অন্তত ছয়মাসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত সাম্প্রতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে নোট করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

৩। নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করাটা খুবই জরুরি। প্রধান প্রধান খবর ছাড়াও বিশেষ করে সম্পাদকীয় পাতায় নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ ভাইভাতে ক্রিটিক্যাল প্রশ্নের জবাব দিতে সাহায্য করে।

পরীক্ষার দিনের প্রস্তুতি

ভাইভা পরীক্ষার আগের রাত ও পরীক্ষার দিনের কিছু প্রস্তুতি আছে। সেগুলো হলো:

- **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নেওয়া:** বিসিএস ভাইভায় অংশগ্রহণ করতে বেশ কিছু কাগজপত্রের মূল ও সত্যায়িত কপি নিয়ে যেতে হয়। এর মধ্যে সদ্য তোলা ছবি, NID কার্ড, এডমিট কার্ড, অ্যাপ্লিক্যান্ট কপি, বিপিএসসি ফর্ম-৩, সাক্ষাৎকার পত্র, পুলিশ ভেরিফিকেশন ফর্ম, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ, নাগরিকতার সনদ, ওজন ও উচ্চতার জন্য ডাক্তার কর্তৃক সত্যায়িত সার্টিফিকেট ইত্যাদি রয়েছে। সকল প্রয়োজনীয় কাগজ পিএসসির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গুছিয়ে আগেভাগেই প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সত্যায়িত ফটোকপি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি করে রাখা ভালো। এই কাগজের ঝামেলা আগেই মিটিয়ে রাখা ভালো, তাহলে মানসিকভাবে শান্তিতে থাকা যায়।

- **ঘুম:** ভাইভা পরীক্ষার আগের রাতে পর্যাপ্ত ঘুম খুবই প্রয়োজনীয়। তাই ভাইভার আগের রাতে আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। আগের রাতে আতঙ্কিত হয়ে না ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে তার বাজে প্রভাব পড়বে ভাইভার সময়। তাই রাত না জেগে ঘুমানো উচিত।

- **পোশাক:** ভাইভা পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের অন্যতম মাথাব্যথা থাকে কী পোশাক পরে যাবে তা নিয়ে। এ ব্যাপারে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। ছেলেদের জন্য ফর্মাল শার্ট, টাই, প্যান্ট, অক্সফোর্ড জুতা এবং সুটই স্ট্যান্ডার্ড ড্রেস কোড। শার্টের রং সাদা বা অন্য কোনো হালকা রঙের বা স্ট্রাইপ হতে পারে। সুটের রং কালো, নেভি ব্লু বা ধূসর এরকম কোনো মার্জিত রঙের হতে পারে, তার সাথে ম্যাচিং করে প্যান্ট, সাথে টাই এবং টাইক্লিপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জুতা, বেল্ট ও ঘড়ির ফিতার রং একই থাকবে, মোজার রং হবে প্যান্টের রঙের সাথে মিলিয়ে। যারা পাঞ্জাবি-টুপি পরেন তারাও সাদা বা কাছাকাছি কোনো হালকা রঙের পরতে পারেন সেক্ষেত্রে পাঞ্জাবির ওপর ওয়েস্ট কোট (কোটি) পরিধান করা যেতে পারে। মেয়েরা শাড়ি বা সেলোয়ার কামিজ যেকোনো একটা পরতে পারবে, সাথে মানানসই সাজগোজ। খুব দৃষ্টিকটু বা চোখে লাগে এমন সাজ পরিহারযোগ্য। এক কথায় বলতে গেলে- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত পোশাকই যথেষ্ট, যাতে ভাইভা বোর্ডে প্রার্থীর প্রথম দর্শনেই একটি ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়।

- **পিএসসিতে সময়মতো যাওয়া:** বিসিএস ভাইভা ঢাকার আগারগাঁও এ অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন এ (পিএসসি ভবনে) আয়োজিত হয়। তাই যারা ঢাকার বাইরে থাকেন তারা ২-১ দিন হাতে রেখেই পিএসসি ভবনের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে থাকার চেষ্টা করবেন। যারা ঢাকাতেই কিছুটা দূরে থাকেন তাদের রাস্তার জ্যামের কথা মাথায় রেখে আগেভাগে রওনা দিতে হবে। পিএসসি ভবনে সকাল আটটা থেকে ক্যান্টিনে বসা যায়। আগে গিয়ে ক্যান্টিনে বসে থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কোনোভাবেই যেন দেরি হয়ে না যায় সেদিকে সাবধান থাকতে হবে।

- **শেষ মুহূর্তের পড়া:** ভাইভার দিন সকালে নতুন করে দেখার কিছু নেই। আগে থেকে করা নোটে চোখ বুলানো যেতে পারে। আর ভাইভার দিনের পত্রিকাগুলোর প্রধান শিরোনাম দেখে নিতে হবে, কোনো বিশেষ খবর আছে কিনা। আগে আগে ঘুমিয়ে সকাল সকাল উঠে শান্তমনে ও ঠান্ডা মাথায় ভাইভা দিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সকল কাগজপত্র নেওয়া হয়েছে কিনা বের হওয়ার আগে আরেকবার ভালোমতো চেক করতে হবে। হাতে সময় নিয়ে বের হয়ে যেতে হবে।

ভাইভা কক্ষে করণীয়-বর্জনীয়

ভাইভা বোর্ডের সামনের ১৫-২০ মিনিটই একজন প্রার্থীর সুদীর্ঘ বিসিএস যাত্রার ফলাফল অনেকটা নির্ধারণ করে দেয়। তাই ভাইভা কক্ষে কী কী করণীয় আর কী কী বর্জনীয় তা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। ভাইভা কক্ষে একজন প্রার্থীর যা যা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে:

- **ভাইভা কক্ষে প্রবেশ ও বের হওয়ার আদব:** ভাইভা কক্ষে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে, অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে "স্যার আসতে পারি?" বা ইংরেজিতে "May I come in sir?" বলা যেতে পারে। তবে ইংরেজিতে বললে ভাইভা ইংরেজিতে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রবেশের পর দরজা লাগিয়ে দেওয়া ভদ্রতা। দরজা থেকে চেয়ার পর্যন্ত হেঁটে আসার ভঙ্গিও স্যাররা লক্ষ্য করেন তাই স্মার্টলি, ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটতে হবে। শারীরিক ভাষায় যেন কোনো দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। বসার জন্য অনুমতি পাওয়ার আগে বসা যাবে না। ভাইভা শেষে বের হওয়ার সময় একদম পশ্চাৎ প্রদর্শন না করে একটু পিছিয়ে গিয়ে তারপর বের হওয়াটা ভদ্রতা। দরজা খোলা ও লাগানোর সময়, চেয়ার সরিয়ে বসার সময় যেন জোরে শব্দ না হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।
- **আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভার থাকা:** বিসিএস ভাইভা পরীক্ষা নিয়ে প্রার্থীদের মধ্যে একটি সাধারণ ভুল ধারণা আছে- "ভাইভাতে করা সব প্রশ্নের উত্তর মনে হয় পারা লাগে, নইলে ভালো নম্বর পাওয়া যায় না বা পাশ হয় না"। আর যেহেতু ভাইভার কোনো ধরাবাঁধা সিলেবাস নেই এবং কারো পক্ষেই সকল বিষয় সম্পর্কে সব তথ্য জানা সম্ভব নয় তাই অনেক প্রার্থীই আগেই দুশ্চিন্তায় ভোগেন ও নার্ভাস হয়ে যান। তবে পূর্ববর্তী বিসিএসগুলোতে ক্যাডার পাওয়া প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা আলোচনা করে বুঝা যায়, ভাইভা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ প্রার্থীদের শুধু জ্ঞানই নয়, মূলত তাদের ব্যক্তিত্ব ও ভাইভা বোর্ডে বিভিন্ন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করছে সেটাই দেখেন। কারণ প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষাতেই একজন প্রার্থীর জ্ঞানের যাচাই হয়ে যায়। ভাইভা মূলত তিনি মানুষ হিসেবে কেমন সেটাই পিএসসি দেখতে চায়। তাই কী প্রশ্ন করবে, পারবেন কি পারবেন না- এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে মৌলিক ও আবশ্যিক বিষয়গুলো ভালোভাবে পড়ে নির্ভার হয়ে ভাইভা বোর্ডে ঢুকতে হবে। ভাইভা চলাকালীন সর্বদা একটা ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখতে হবে। বোর্ডের সামনের অতিরিক্ত নার্ভাসনেস, ভয়ে কুঁকড়ে থাকা ভাব যেন প্রকাশ না পায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে।
- **ভুল উত্তর না দেওয়া ও সময়ক্ষেপণ না করা:** আগেই বলা হয়েছে- একজন প্রার্থী সব প্রশ্নের উত্তর জানবে- এটা কোনো ভাইভা বোর্ডই আশা করেনা। সাধারণত দেখা যায়, কোনো টপিকের উপর খুব কমন একটি প্রশ্ন দিয়েই শুরু হয় যা যেকোনো ভাইভা প্রার্থীরই পারা উচিত। এরপর ধারাবাহিক ভাবে সেই বিষয়ে আরো গভীর থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। কোনো প্রার্থী যখন বুঝবেন, কোনো প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই তখন আন্দাজে ভুল উত্তর দেওয়া যাবে না। বরং ভদ্রতার সাথে "সরি স্যার এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই" বলাই শ্রেয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে অযথাই সময়ক্ষেপণ করলে বা ভুল উত্তর দিলে শিক্ষকরা অত্যন্ত বিরক্ত হন।
- **ভাষার ব্যবহারে সতর্কতা:** ভাইভা বোর্ডে মেম্বাররা ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে ইংরেজিতেই উত্তর দিতে হবে। অনেক সময় তাঁরা নিজেরা বাংলায় প্রশ্ন করে ইংরেজিতে উত্তর করতে বলেন। বাংলায় উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার টান যেন চলে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও 'এ' কে 'অ্যা', 'ঢ' কে 'ড' বা 'খ' কে 'ক' উচ্চারণ করার মতো ভুল এড়াতে হবে। ইংরেজি-বাংলা মিশ্রণ করা, কৃত্রিম উচ্চারণ বা ঢং এ কথা বলা পরিহার করতে হবে। মুখের ভাষার জড়তা ও ত্রুটি কাটাতে আগে থেকেই প্র্যাক্টিস করলে উপকার পাওয়া যাবে। এছাড়া অনেকের বিভিন্ন মুদ্রাদোষ থাকে, যেমন- কথায় কথায় 'ইয়ে' 'কিন্তু ধরেন' 'একচুয়ালি' ইত্যাদি বারবার বলা- এসব যতটা সম্ভব কমাতে হবে।
- **আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ভদ্রতা:** ভাইভাতে যেহেতু একজন প্রার্থীর মূলত ব্যক্তিত্ব ও আচরণই দেখা হয় তাই সর্বাবস্থায় নিজের ভদ্রতা, বিনয় ও মার্জিত ভাব বজায় রাখতে হবে। খুব বেশি গম্ভীর বা গোমড়া মুখ করে যেমন থাকা যাবে না তেমন অতিরিক্ত হাসাহাসিও করা যাবেনা। চোখেমুখে একটা সপ্রতিভ ইতিবাচক ভাব ধরে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে ভাইভা বোর্ডে বিতর্কিত, উসকানিমূলক বা কিছুটা অপমানমূলক কথাও বলা হয় প্রার্থীকে যাচাই করা জন্য। সেসব ক্ষেত্রে খুব বিচক্ষণতার সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ইতিবাচক উত্তর দিতে হবে, কোনো অবস্থাতেই মেজাজ হারানো যাবেনা। মনে রাখতে হবে, এসব কিছুই পরীক্ষামাত্র, ভাইভা বোর্ডের সাথে প্রার্থীর কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। যেকোনো পরিস্থিতিতে ভদ্রতা, নম্রতা, ইতিবাচকতা বজায় রাখাটাই ভাইভা কক্ষে মূল কাজ।
- **নিজ বক্তব্যে অটল থাকা ও উপস্থিতবুদ্ধি:** বিসিএস ভাইভাতে অকৃতকার্য করার অন্যতম একটি প্রধান কারণ ভাইভা বোর্ডের সামনে দ্বিধান্বিত ভাবনা, নিজ উত্তরে অটল না থাকতে পারা। কোনো প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত ভাবে জানলেই তবে উত্তর করা উচিত আর নিজের উত্তরে অটল থাকতে হবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত না হলে উত্তর না করাই ভালো। বোর্ড মেম্বাররা অনেক সময় প্রার্থীদের কনফিউসড করে দিতে সন্দেহ জাগিয়ে তোলেন, সেই ফাঁদে পড়া যাবে না। আবার অনেক সময় কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় উপস্থিতবুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে মানসিকভাবে নির্ভার ও ইতিবাচক থাকাটাই কাজে দেয়। কোনো বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সেটা নিজের বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপন না করে তৃতীয় কোনো পক্ষের রেফারেন্স দিয়ে উত্তর করা উচিত। আর সর্বোপরি সরল সত্য কথাই বলা উচিত। নিজের সম্পর্কে বা যেকোনো ব্যাপারে মিথ্যা বললে পরে আরো অনেক মিথ্যা বলা লাগতে পারে যা মানসিক ভাবে দুর্বল করে দেয়। তাই একেবারে অপারগ না হলে সত্য কথাই বলা উচিত।

> **রেফারেন্স বুক**
>
> বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস, সমস্যা, সম্ভাবনা ও সংস্কার চিন্তা নিয়ে নিচের বিশ্লেষণধর্মী বইটি পড়তে পারেন-
>
> ১. **GRESHAM'S LAW SYNDROME AND BEYOND: An Analysis of the Bangladesh Bureaucracy (Akbar Ali Khan)**

ভাইভা পূর্ববর্তী-পরবর্তী করণীয়

পিএসসির ওয়েবসাইট মাঝেমধ্যে ভিজিট করতে হবে যেন পিএসসি কর্তৃক বিভিন্ন তথ্য চেয়ে গুগল ফর্ম পূরণ করার নির্দেশনা নজর এড়িয়ে না যায়।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬

- বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়: First-Past-The-Post Voting (FPTP);
- **রাজনৈতিক দল:** ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করছে। (মোট নিবন্ধিত দল ৬০টি);
- ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যালটের রং সাদাকালো এবং গণভোটের ব্যালটের রং গোলাপী;
- **সুপার ক্যারাভান:** ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের বিষয়ে গণভোটের বিষয়ে সারাদেশে (৬৪টি জেলা ও ৩০০টি উপজেলা) প্রচারণার লক্ষ্যে যাত্রা করা ১০টি ভোটের গাড়ি;
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মতো 'না' ভোট চালু করা হয় ২০০৯ সালে (৯ম জাতীয় সংসদ);
- **বাংলাদেশের প্রথম নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল:** লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি);
- **নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়:** ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬;
- **মোট প্রার্থী:** ১৯৮১ (৩০০ আসনে, স্বতন্ত্র: ২৭৫টি, স্থগিত: ১টি আসন);
- **মোট ভোটার:** ১২,৭৭,১১,৭৯৩ জন;
- **পুরুষ ভোটার:** ৬,৪৮,২৫,৩৬১ জন;
- **নারী ভোটার:** ৬,২৮,৮৫,২০০ জন;
- **তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার:** ১,২৩২ জন;
- **সর্বাধিক প্রার্থী:** ঢাকা- ১২ আসনে (১৫ জন);
- **কম প্রার্থী:** পিরোজপুর- ১ আসনে (২ জন)।

দলভিত্তিক আসন সংখ্যা

বিএনপি: ২৮৮	এনসিপি: ৩২	কমিউনিস্ট পার্টি: ৬৫
জামায়াতে ইসলামী: ২২৪	জাতীয় পার্টি: ১৯২	অন্যান্য দল: ৫৮৮
ইসলামী আন্দোলন: ২৫৩	গণ অধিকার পরিষদ: ৯০	স্বতন্ত্র: ২৪৯

- আসনভিত্তিক ভোটার সংখ্যা = সর্বাধিক: গাজীপুর-২ (ভোটার: ৮,০৪,৩৩৩); কম: ঝালকাঠি-১ (ভোটার: ২,২৮,৪৩১)।
- জেলাভিত্তিক ভোটার সংখ্যা = সর্বাধিক: ঢাকা (ভোটার: ৮৪,৭৪,৯৮৫; কম: বান্দরবান (ভোটার ৩,১৫,৪২২)।

নির্বাচনের ফলাফল

- **বিজয়ী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), প্রাপ্ত আসন: ২০৯টি।
- **প্রধান বিরোধী দল:** বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রাপ্ত আসন: ৬৮টি।
- **অন্যান্য দল:** জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), প্রাপ্ত আসন: ৬টি। অন্যান্য: স্বতন্ত্র ও অন্য সব দল: ১৪টি।
- **গণভোট পড়েছে:** ৬০.২৬ শতাংশ (হ্যাঁ ভোট: ৭৭%, না ভোট: ২৩%)।

বাংলাদেশ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ

পদ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
সংসদ নেতা	তারেক রহমান
স্পীকার	মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমেদ
ডেপুটি স্পীকার	ব্যারিস্টার কায়সার কামাল
বিরোধী দলীয় নেতা	ডা. শফিকুর রহমান
বিরোধী দলীয় উপনেতা	ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের
চিফ হুইপ	নুরুল ইসলাম মনি
হুইপ	জি কে গউছ; রফিকুল ইসলাম; মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু; আখতারুজ্জামান মিয়া; এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু; এ বি এম আশরাফ উদ্দিন মিজান
বিরোধী দলীয় হুইপ	নাহিদ ইসলাম

পোস্টাল ভোট

- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার অ্যাপ: Postal Vote BD (উদ্বোধন: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫)।
- স্লোগান: আপনার ভোট, আপনার অধিকার।
- পোস্টাল ব্যালটের ভোটাররা ভোট দেয়: ২১ জানুয়ারি থেকে। পোস্টাল ব্যালটের খাম: হলুদ রঙের।
- ৪ শ্রেণির (প্রবাসী, সরকারি চাকরিজীবী, নির্বাচনি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, কারাবন্দি) নাগরিক পোস্টাল ভোট দেয়।
- ১৫৭টি দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভোট দিয়েছে (সবচেয়ে বেশি ভোটার: জেলা কুমিল্লা; দেশ সৌদি আরব)।

OCV ও ICPV এর পার্থক্য

OCV (Out of Country Voting)	ICPV (IT-Supported Postal Voting)
দেশের বাইরের ভোটারদের (বিদেশে থাকা বাংলাদেশি নাগরিক) জন্য ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা।	দেশের মধ্যে থেকেও যারা নির্দিষ্ট কারণে (সরকারি চাকরিজীবী, নির্বাচনি দায়িত্বপ্রাপ্ত, আনসার ও ভিডিপি, কারাবন্দি) ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেন না, তাদের জন্য।

গণভোট

গণভোট কী?

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় যেমন-সংবিধান সংশোধন, আইন তৈরি, এমনকি শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও জনগণের সমর্থন রয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলা হয়। যেখানে জনগণ সরাসরি ভোট দেওয়ার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত দেয়। ব্যালটে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোটের মাধ্যমে গণভোট নেওয়া হয়।

ইতিহাস

ইংরেজি Referendum এর বাংলা প্রতিশব্দ 'গণভোট'। গণভোটের নাম এবং ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টন গ্রাউবুনডেনে। ১৮৪৮ সালে সুইজারল্যান্ড সন্ডারবান্ড যুদ্ধের পর সুইজারল্যান্ড তাদের নাগরিকের প্রাথমিক সমাবেশ বাতিল করে দেয় গণভোটের মাধ্যমে। এর মাধ্যমেই প্রথম আধুনিক গণভোটের সূচনা হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গণভোটের সংখ্যা হ্রাস পেলেও ১৯৭০ সাল থেকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে গণভোটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে গণভোট

১৯৯১ সালে তৃতীয় গণভোটের আগে গণভোট আইন হয়। জাতীয় সংসদে পাস হওয়া সেই আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়, 'যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার অথবা ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০, ৯২ক বা ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া কোনো বিল উক্ত সংবিধানের ১৪২ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে গৃহীত হইবার পর উহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান করিবেন কি করিবেন না, এই প্রশ্ন যাচাইয়ের জন্য সংবিধানের ১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক গণভোটের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।' ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোটের সেই বিধান বাতিল করা হয়। কিন্তু জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ১৭ডিসেম্বর, ২০২৪ ওই সংশোধনী বাতিলের মামলায় হাইকোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি গণভোটও পুনর্বহাল করে রায় দেয়।

উল্লেখযোগ্য তথ্যসমূহ

- গণভোট দিবস: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (হ্যাঁ/না)।
- স্লোগান: মনে রাখবেন, পরিবর্তনের চাবি এবার আপনার হাতে।
- জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংশোধন) বাস্তবায়নে গণভোট অধ্যাদেশ জারি: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।
- গণভোটের বিধান বাতিল: পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে (২০১১): পুনরায় বহাল: ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫।
- আধুনিক গণভোটের ধারণার সূচনা ফ্রান্সে (১৭৯৩), প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মিত গণভোট ব্যবস্থার সূচনা সুইজারল্যান্ডে।

দেশে অনুষ্ঠিত গণভোট

বাংলাদেশে মোট চারবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে দুটি প্রশাসনিক গণভোট এবং বাকি দুইটি সাংবিধানিক গণভোট।

প্রথম গণভোট	দ্বিতীয় গণভোট	তৃতীয় গণভোট	চতুর্থ গণভোট
২২ এপ্রিল ১৯৭৭ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে গণভোটের ঘোষণা দেন। ৩০ মে ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং তার নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা আছে কি না, সে বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করে। গণভোটে ৮৮.১% মানুষ ভোট দেয়। এর মধ্যে 'হ্যাঁ' ভোট পড়ে ৯৮.৯% আর 'না' ভোট পড়ে ১.১%।	২১ মার্চ ১৯৮৫ দেশে দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতি ও কর্মসূচি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের ওপর জনগণের আস্থা আছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য ওই গণভোটের আয়োজন করা হয়। জনগণের আস্থা থাকলে জেনারেল এরশাদের ছবিসহ 'হ্যাঁ' বাক্সে এবং আস্থা না থাকলে 'না' বাক্সে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। গণভোটে ভোট পড়ে ৭২.২% এর মধ্যে 'হ্যাঁ' ভোট ছিল ৯৪.৫% আর 'না' ভোট ছিল ৫.৫%।	গণ আন্দোলনে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ পদত্যাগ করেন সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয় বিএনপি। ১৬ বছরের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা থেকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ আগস্ট ১৯৯১ জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। জাতীয় সংসদে গৃহীত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার পর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে থাকা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সম্মতি দেবেন কি না, সে প্রশ্নে দেশব্যাপী গণভোট আয়োজনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। গণভোটে ভোট পড়ে ৩৫.২%। ভোটে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে, অর্থাৎ 'হ্যাঁ' ভোট ছিল ৮৪.৩৮%। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার পক্ষে অর্থাৎ 'না' ভোটের হার ছিল ১৫.৬২%।	জুলাই জাতীয় সনদে সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কিত ৪টি প্রস্তাবের উপর (হ্যাঁ/না) গণভোট (Referendum) অনুষ্ঠিত হবে। ১. নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে। ২. আগামী জাতীয় সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে। ৩. সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে একমত হয়েছে- সেগুলো বাস্তবায়ন জাতীয় সংসদ নিশ্চিত করতে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকবে। ৪. জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী

পরিচিতি

নাম	তারেক রহমান (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারেক রহমান দেশের ১৩তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিসহ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১১জন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছেন, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে তারেক রহমান দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী)।	
জন্ম	২০ নভেম্বর, ১৯৬৭, (ঢাকা)।	
পড়াশোনা	S.S.C., H.S.C. বি.এ.এফ শাহীন হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অসমাপ্ত)।	
পিতা	জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম), সাবেক রাষ্ট্রপতি।	
মাতা	বেগম খালেদা জিয়া (সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।	
স্ত্রী	ডা: জোবায়দা রহমান (কার্ডিওলজিস্ট)	
কন্যা	ব্যারিস্টার জাইমা জারনাজ রহমান (আইনজীবী)।	
রাজনৈতিক দল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।	
নির্বাচিত সংসদীয় আসন	ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ আসন (ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন)।	
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে)।	
দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।	
তারেক রহমানের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে সংকলিত বই- The Political thought of Tarique Rahman (প্রকাশিত: ২০১৩)।		

দলীয় পদবি

- চেয়ারম্যান (২০২৬-বর্তমান)।
- ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (২০১৮-২০২৬)।
- সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (২০০৯)।
- সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক (২০০২)।
- সাধারণ সদস্য, গাবতলী ইউনিট, বগুড়া (১৯৮৮)।

রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখা সংক্রান্ত ৩১দফা প্রণয়ন (শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘোষিত ১৯ দফা ও বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত বিএনপির ভিশন-২০৩০ এর আলোকে দেশনায়ক তারেক রহমানের ঘোষিত ২৭ দফা কর্মসূচির সংশোধিত ও সম্প্রসারিত রূপে প্রণীত)।
- ওয়ান ইলেভেনের সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার এবং কারাগারে থাকাকালীন রিমান্ডে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন।
- ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজপথে ভূমিকা পালন এবং গৃহবন্দীত্ব বরণ করেন।
- বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ নীতি যেমন: কৃষকদের জন্য সরকারি ভর্তুকি, বয়স্কদের জন্য ভাতা, প্লাস্টিক ব্যাগ বিরোধী আন্দোলন, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বিতরণ ইত্যাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন (২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫)

- লন্ডনে রাজনৈতিক নির্বাসন (২০০৮-২০২৫)।
- ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কারাবন্দীকালীন অসুস্থ অবস্থায় জামিনে মুক্ত হয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ।
- ২০১২ সালে ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন।
- দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে লন্ডন থেকে দল পরিচালনা।

মন্ত্রিসভা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে নতুন মন্ত্রিপরিষদে ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে পূর্ণমন্ত্রীতে ১ জন ও প্রতিমন্ত্রীতে ২ জন নারী রয়েছেন। এবং এই মন্ত্রিসভায় ৩ জন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী রয়েছেন।

ছায়া মন্ত্রিসভা

ছায়া মন্ত্রিসভা (Shadow Cabinet বা Shadow Ministry) হলো সংসদের বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল মন্ত্রিসভা। এখানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের বিপরীতে একজন করে 'ছায়া মন্ত্রী' থাকেন। এই মন্ত্রীরা মূলত বিরোধীদলের আইনপ্রণেতা। তারা ক্ষমতায় না থাকলেও সংশ্লিষ্ট খাতের নীতি, বাজেট, আইন ও কর্মসূচি নিয়ে বিকল্প ভাবনা তুলে ধরেন।

ছায়া মন্ত্রিসভার কাজ

- প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত, ব্যয়, নীতি ও আইন প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে সমালোচনা ও প্রশ্ন তোলেন।
- শুধু বিরোধিতা নয়, একই ইস্যুতে নিজেদের নীতিগত সমাধান তুলে ধরেন।
- সংসদীয় বিতর্কে নেতৃত্ব: বাজেট, আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, সব বড় আলোচনায় ছায়া মন্ত্রীরা খাতভিত্তিক বক্তব্য দেন।
- পরবর্তীতে নির্বাচনে জয়ী হলে এই ছায়া মন্ত্রীরাই প্রায়শই মন্ত্রীর দায়িত্ব পান, ফলে তাদের প্রশাসনিক প্রস্তুতি আগে থেকেই থাকে।
- সংবাদ সম্মেলন, নীতিগত প্রস্তাব-প্রচারণার মাধ্যমে সরকারের বিকল্প রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করে।

যেসব দেশে ছায়া মন্ত্রিসভা রয়েছে

ছায়া মন্ত্রিসভা মূলত গ্রেট ব্রিটেনের ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চাকারী দেশগুলোয় বেশি প্রচলিত। ছায়া মন্ত্রিসভার সবচেয়ে কার্যকর, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রভাবশালী রূপ দেখা যায় যুক্তরাজ্যে। এখানে বিরোধী দলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয় His Majesty's most loyal opposition অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত কিন্তু সরকারের বিরোধী। কানাডাতে ছায়া মন্ত্রিসভাকে কখনও 'অপজিশন ক্রিটিক' বলা হয়। সেখানে প্রতিটি খাতের জন্য সমালোচক নির্ধারিত থাকে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, জ্যামাইকা, মালয়েশিয়া, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোসহ আরও কয়েকটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশে বিভিন্ন মাত্রায় ছায়া মন্ত্রিসভার চর্চা রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বর্তমানে ছায়া বা সাংবিধানিক কাঠামো নেই। ঐতিহাসিকভাবে এখানে এর খুব একটা চর্চাও হয়নি। তবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের কথা বলে। বাংলাদেশে প্রথমবার ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হলে, সেটি দেশের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফ্যামিলি কার্ড

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম যুগান্তকারী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো 'ফ্যামিলি কার্ড'। দেশের বেকার, দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর আর্থিক সংকট দূর করতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এই কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে, যা প্রচলিত অন্যান্য সামাজিক ভাতার চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ।

ফ্যামিলি কার্ড

ফ্যামিলি কার্ড মূলত একটি বিশেষ ডেটাবেস ভিত্তিক পরিচয়পত্র, যার মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলো নিয়মিত সরকারি আর্থিক অনুদান পাবে। এই কার্ডের অর্থ সরাসরি পরিবারের গৃহকর্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে, যা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে। সরকার আগামী ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে দেশের ৫০ শতাংশের বেশি যোগ্য পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রথম ধাপে ৩৭,৫৬৭ পরিবারকে মাসিক ২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। জি-টু-পি পদ্ধতিতে সরাসরি মোবাইল ওয়ালেট বা ব্যাংক একাউন্টে এই টাকা পৌঁছে যাবে। ১০ মার্চ, ২০২৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ফ্যামিলি কার্ড প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। ১৪টি পাইলট প্রজেক্ট এলাকায় এই অর্থ দেওয়া শুরু হয়েছে। এলাকাগুলো হলো- রাজধানীর বস্তি (কড়াইল, সাততলা, ভাসানটেক, শাহআলী, বাগানবাড়ী), রাজবাড়ী, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খুলনা, ভোলা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া সদর, নাটোর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর। ২.১১ কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ফ্যামিলি কার্ডের বিশেষ সুবিধাসমূহ

নতুন সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

- **ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ:** বর্তমানে প্রচলিত বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা বা অন্যান্য ভাতার তুলনায় এই কার্ডের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ অন্তত দ্বিগুণ হবে।
- **নারীর আর্থিক স্বাধীনতা:** কার্ডের অর্থ সরাসরি পরিবারের নারী বা গৃহকর্ত্রীর কাছে পৌঁছাবে। এতে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
- **দ্রুত বাস্তবায়ন:** দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতে আগামী ঈদুল ফিতরের আগেই পাইলট প্রকল্প আকারে কয়েকটি এলাকায় এর কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।
- **মৌলিক চাহিদা পূরণ:** বেকার বা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলো নিয়মিত ভাতার মাধ্যমে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারবে।

খাল খনন কর্মসূচি

কৃষিজমিতে সেচসুবিধা বাড়াতে ৫ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের অঙ্গীকার করেছিল বিএনপি। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর ১৬ মার্চ খাল খনন কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়।

সরকারের তিন মন্ত্রণালয়ের চারটি সংস্থা প্রথম ধাপে ১ হাজার ২০৪ কিলোমিটার খাল খনন করবে। এ কাজ করা হবে বিদ্যমান প্রকল্পের আওতায়। পাশাপাশি নতুন প্রকল্প নেওয়ার কাজ চলছে।দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় সাহাপাড়া খাল খননের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সময়ে দেশের ৫৪টি জেলায় একই কর্মসূচি শুরু হবে। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, চিফ হুইপ, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ জেলায় খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৭ সালে খাল খননের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। বিএনপি এবার তার নির্বাচনি ইশতেহারে বলেছে, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত 'স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচি' পুনর্বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশপ্রেমী জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন, পুনঃখনন ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের হারিয়ে যাওয়া ৫২০টি নদী, হাজার হাজার খাল ও তাদের প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ পুনরুদ্ধার ও সেচব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

কৃষক কার্ড

কৃষি খাতে সরকারের দেওয়া ভর্তুকি, ঋণ ও প্রণোদনার মতো সুবিধা কৃষকের কাছে সহজলভ্য করতে কৃষকদের কার্ডের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী ৪ বছরে ১ কোটি ৬৫ লাখ কৃষকের হাতে এই কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে কৃষক কার্ডের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ বছরে ৬৮১ কোটি টাকা। এই কার্ডে কৃষকের ৪৫ ধরনের তথ্য থাকবে। মৎস্যচাষি ও দুগ্ধখামারিরাও এ কার্ডের সুবিধা পাবেন।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা গড়ে ২,৫০০ টাকা করে ভর্তুকি বা কৃষি উপকরণ সহায়তাসহ একজন কৃষক প্রাথমিকভাবে ১০ ধরনের সুবিধা পাবেন। সুবিধার মধ্যে থাকছে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সরকারি ভর্তুকি, সরকারি প্রণোদনা, ন্যায্যমূল্যে সেচসুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, কৃষি বিমাসুবিধা, ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা, কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ, আবহাওয়ার তথ্য ও রোগবালাই দমনে পরামর্শ।

এ কার্ডের আওতায় জমির পরিমাণ অনুযায়ী কৃষক সার কিনতে পারবেন। প্রথম ধাপে ২১ হাজার ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ৫ শতাংশের কম জমির মালিক হলে ভূমিহীন, ৫ থেকে ৪৯ শতাংশের মালিক হলে প্রান্তিক ও ৫০ থেকে ২৪৯ শতাংশ জমির মালিক হলে তাকে ক্ষুদ্র কৃষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ উপলক্ষ্যে আগামী ১৪ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে 'কৃষক কার্ড' বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

বাণিজ্য ও চুক্তি

বাংলাদেশ – যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি (Agreement on Reciprocal Trade)

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ও আমেরিকার বাৎসরিক বাণিজ্য ৮০০ কোটি ডলারের। যেখানে, বাংলাদেশ বছরে গড়ে ৬০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির বিনিময়ে আমদানি করে ২০০ কোটি ডলারের পণ্য। এই ৪০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য ঘাটতির বিপরীতে প্রথম ধাপে আমেরিকা গত বছর এপ্রিলে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে আমেরিকার সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি করার শর্তে দ্বিতীয় ধাপে গত আগস্টে পাল্টা শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা দেন।

স্বাক্ষরিত চুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রে বাজার সুরক্ষা এবং শুল্ক বাধা কমানোর লক্ষ্যে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে 'Agreement on Reciprocal Trade' স্বাক্ষরিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

- বাংলাদেশের জন্য পাল্টা শুল্ক ২০% থেকে ১% কমিয়ে ১৯% নির্ধারণ করা হয়েছে। যা পূর্বের ১৫% নিয়মিত শুল্কসহ মোট ৩৪%।
- চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ আমেরিকা থেকে ১৪টি বোয়িং উড়োজাহাজ কিনবে, ১৫ বছরে জ্বালানি কিনবে ১৫শ কোটি ডলারের, তৈরি পোশাক খাতের কাঁচামাল হিসেবে তুলা কিনবে বছরে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি ডলার।
- মার্কিন তুলা ও কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার করে তৈরি পোশাক রপ্তানি করলে তা ০% শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে।
- বাংলাদেশ মোট ৬৭১০ টি মার্কিন পণ্যে শুল্ক ছাড় দিবে; বিপরীতে বাংলাদেশ ১৬৩৮টি পণ্যে পাল্টা মার্কিন শুল্ক থেকে ছাড় পাবে।

সীমাবদ্ধতা

- মার্কিন পণ্যে শুল্ক শূন্য করায় রাজস্ব আয়ে ধস নামবে।
- ৩০-৩৫ হাজার কোটি টাকার-১৪ টি বোয়িং ক্রয়ে আর্থিক চাপ বাড়বে সরকারের।
- চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশের বন্দর ও লজিস্টিক নেটওয়ার্কের ডিজিটাল প্লাটফর্মে মার্কিন সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এতে জাতীয় নিরাপত্তা ও সাইবার ঝুঁকি বাড়বে।
- চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ অবাধে চীন বা রাশিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে FTA করতে পারবে না। করলে পুনরায় ৩৭% শুল্ক আরোপিত হবে।
- ভারত থেকে তুলা আনতে খরচ ও সময় কম লাগে। মার্কিন তুলা আমদানিতে আমদানি খরচ ও সময় বেশি লাগবে।
- বছরে অতিরিক্ত ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্যে আমদানির শর্ত আমাদের কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- আমদানিকৃত আমেরিকার পণ্যের মান যাচাই করা যাবে না। ফলে, অভ্যন্তরীণ বাজার ও স্বাস্থ্যখাত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
- বিনিয়োগে দেশের নিজস্ব কোম্পানির মতো আমেরিকার কোম্পানিগুলোকেও অনুরূপ সুবিধা দিতে হবে। ফলে, ভর্তুকি দিয়ে দেশীয় শিল্প সুরক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি বলে মনে করা হচ্ছে, ফলে বিভিন্ন মহলে এর কার্যকারিতা নিয়ে নিয়মিত প্রশ্ন উঠছে। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আরোপিত পাল্টা শুল্ক মার্কিন আদালতে বাতিল হওয়ায় ঢাকা-ওয়াশিংটনের বাণিজ্য চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ-জাপান বাণিজ্য

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ জাপানের সঙ্গে Economic Partnership Agreement (EPA) স্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এই প্রথম কোনো দেশের সঙ্গে এ ধরনের বিস্তৃত অর্থনৈতিক চুক্তি করতে যাচ্ছে। EPA নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা-

EPA

Economic Partnership Agreement (EPA) একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (FTA) তৈরির পরিকল্পনা। এর আওতায় শুল্ক ও অশুল্ক বাধা কমানো, আমদানি কোটা সংশোধন, পণ্য ও সেবা বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করা। সম্প্রতি জাপানের সঙ্গে EPA করার মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি দর-কষাকষি করার পুল তৈরি হবে, যা পরে অন্যান্য দেশ বা অর্থনৈতিক জোটের সঙ্গে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে কাজে আসবে। এটি এমন একটি চুক্তি যার কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, এবং যতদিন কোনো পক্ষ এই চুক্তি বাতিল না করবে, ততদিন চলবে।

EPA'র প্রারম্ভকথা

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ-জাপান EPA নেগোসিয়েশনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গঠিত যৌথ গবেষণা দল তাদের প্রতিবেদন একযোগে প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে ১৭টি সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে নেগোসিয়েশন। পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। ১২ মার্চ ২০২৪ বাংলাদেশ-জাপান EPA নেগোসিয়েশন শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করে। সম্মত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯-২৩ মে ২০২৪ ঢাকায় প্রথম রাউন্ডের নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হয়। তবে কিছু অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের কারণে নেগোসিয়েশন সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। এরপর ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Motegi Toshimitsu-এর সাথে টেলিফোনে আলোচনার মাধ্যমে Bangladesh-Japan Economic Partnership Agreement (BJEPA)-এর নেগোসিয়েশন সম্পন্নকরণের যৌথ ঘোষণা প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে জাপানের রাজধানী টোকিওতে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এই চুক্তি স্বাক্ষর হবে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্য

- ১৯৭১ সালের পর অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে সরাসরি কোনো বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলাদেশে আসেনি।
- ১১ নভেম্বর, ২০২৪ প্রথমবার পানামার পতাকাবাহী জাহাজ 'ইউয়ান জিয়াং ফা ঝং' পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য নিয়ে পৌঁছায়।
- ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রাজস্ব বোর্ডের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দুই দেশের মধ্যে ব্যাবসার সুবিধার্থে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা সব পণ্যের ওপর থেকে বাধ্যতামূলক শতভাগ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন (কায়িক পরীক্ষা) শর্ত প্রত্যাহার করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

৬ অক্টোবর ২০২৫ কর্মী নিয়োগ নিয়ে সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। বিদেশে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব। ১৯৭৬ সাল থেকে দেশটিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে কর্মী নিয়োগ শুরু হয়। তবে দেশটির সঙ্গে সাধারণ কর্মী নিয়োগসংক্রান্ত কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছিল না। ২০১৫ সালে গৃহকর্মী নিয়োগ এবং ২০২২ সালে দক্ষতা যাচাই সংক্রান্ত দুটি বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সৌদি আরব ও বাংলাদেশের দীর্ঘ ৫০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একবারই প্রথম সাধারণ কর্মী নিয়োগসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ বাড়বে এবং কর্মী ও নিয়োগকর্তার অধিকার ও স্বার্থ অধিকতর সুরক্ষিত হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে সহযোগিতা বাড়ানো এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। চুক্তির মধ্য দিয়ে সৌদিতে পাঠানো কর্মীর আইনি সুরক্ষা তৈরি হলো। এখন প্রয়োজনে কর্মীর পক্ষা হয়ে আদালতে যেতে পারবে সরকার। শ্রমিকের সুরক্ষার জন্য এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (BMET) তথ্যমতে, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশ যাওয়া প্রায় ৪৫ লাখ কর্মীর মধ্যে প্রায় ৫৭% গেছেন সৌদি আরবে।

? নমুনা প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন-০১ : ফ্যামিলি কার্ডের সুবিধাগুলো মূলত কারা পাবেন এবং কারা পাবেন না?

উত্তর :

যারা পাবেন (অগ্রাধিকার)	যারা পাবেন না
ক. ভূমিহীন ও গৃহহীন	ক. পেনশনভোগী
খ. প্রতিবন্ধী পরিবার	খ. বাণিজ্যিক লাইসেন্সধারী
গ. অনগ্রসর জনগোষ্ঠী (তৃতীয় লিঙ্গ, বেদে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)	গ. এসি ব্যবহারকারী
ঘ. প্রান্তিক চাষী (০.৫ একরের কম জমি থাকলে)	ঘ. ৫ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্র
	ঙ. গাড়ির মালিক
	চ. সরকারি চাকুরিজীবী

প্রশ্ন-০২ : বাংলাদেশের উন্নয়নে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদানগুলো বলুন-

উত্তর : বেগম জিয়ার অবদানসমূহ-

- ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু;
- যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ;
- ১৯৯২ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন;
- উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু;
- দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা;
- দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা;
- ১৯৯১ সালে শরণার্থী রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন।

প্রশ্ন-০৩ : সংসদে নারী সদস্য কতজন ও বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিসভায় কতজন নারী আছেন?

উত্তর : সংসদের নারী সদস্য ৭ জন এবং নতুন মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য ৩ জন।

প্রশ্ন-০৪ : সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন?

উত্তর : সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী বছরের প্রথম ও নতুন সংসদে প্রথম অধিবেশন হিসেবে সংসদে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের ভাষণের মধ্য দিয়েই প্রথম দিনের অধিবেশন মুলতবি হয়।

প্রশ্ন-০৫ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছেন কে?

উত্তর : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসন থেকে নির্বাচিত খন্দকার মোশাররফ হোসেন কে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বেই স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়।

প্রশ্ন-০৬ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে কয়টি অধ্যাদেশ উপস্থাপন করা হয়েছে?

উত্তর : নবগঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মোঃ আসাদুজ্জামান সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে ১৩৩টি অধ্যাদেশ উপস্থাপন করেন।

প্রশ্ন-০৭ : ভোট কারচুপি ও ইলেকশান ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর :

ভোট কারচুপি	ইলেকশান ইঞ্জিনিয়ারিং
ভোট কেন্দ্র দখল, ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, জাল ভোট, ব্যালট বক্স দখল ইত্যাদি ভোট কারচুপির অন্তর্ভুক্ত।	ভোট গণনায় কারচুপি, ভোট গণনায় ও ফলাফলে সিভিল প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব, মিডিয়া ব্ল্যাকআউট ইত্যাদি ইলেকশান ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্তর্ভুক্ত।

	২১ ফেব্রুয়ারি	গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। সেদিন মিছিলে অংশ নেয়া রফিক উদ্দিন পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন। তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। পুলিশের গুলিতে আরও শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আবুল বরকত (ডাক নাম আবাই), আবদুস সালাম, আবদুল জব্বার প্রমুখ। নয় বছরের শিশু অহিউল্লাহও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। সেদিন পুলিশের গুলিতে ৮ জন শহিদ হন। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে শহিদদের সমাহিত করা হয় আজিমপুর কবরস্থানে।
	২২ ফেব্রুয়ারি	হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ শুরু হয় এবং পুনরায় পুলিশের গুলিতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন।
	২৩ ফেব্রুয়ারি	ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহিদ মিনার।
১৯৫৩	২১ ফেব্রুয়ারি	দেশব্যাপী 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।
১৯৫৪	৭ মে	পাকিস্তান গণপরিষদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
১৯৫৬	১৬ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে অব্যাহত ভাষা আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে।
	২৯ ফেব্রুয়ারি	ফরিদপুরের আদেল উদ্দিন আহমেদের দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী সাংবিধানিকভাবে [২১৪ (১) অনুচ্ছেদ] বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র ছিল 'সাপ্তাহিক সৈনিক' পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক শাহেদ আলী।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পরের ঘটনাপ্রবাহ

২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শোভাযাত্রা চলাকালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান। এছাড়াও শহিদ হন ওলি উল্লাহ ও রিকশা চালক আব্দুল আউয়াল। দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রাদেশিক আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। উত্তেজিত জনতা 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার প্রেস আক্রমণ করে অগ্নি সংযোগ করে। নওবেলাল পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ আলী মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমান এর পিতা মাহবুবুর রহমান। ২৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

কুমিল্লার কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধু আব্দুস সালাম এবং তাদের সংগঠন 'Mother Language Lover of the World' ১৯৯৮ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের নিকট পত্র লেখেন। এই প্রেক্ষিতে ১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ৩১তম বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০০০ সালে প্রথম বারের মতো ১৮৮ টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম কে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০০২ সালে বাংলাদেশে মহান ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। আর একই বছর আফ্রিকান দেশ সিয়েরালিওন বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম 'অনারারি অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ বা সম্মানসূচক সরকারি ভাষা' হিসেবে ঘোষণা করে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আহমাদ তেজান কাব্বাহ (২০০২)।

ভাষা আন্দোলনের সময় নেতৃস্থানীয় প্রধানের নামের তালিকা

পদবি	নাম	পদবি	নাম
গভর্নর জেনারেল	গোলাম মোহাম্মদ	পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক	ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)
প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিম উদ্দিন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
মুসলিম লীগের সভাপতি	খাজা নাজিম উদ্দিন	পুলিশ বিভাগের আই.জি	এ. এইচ. এম. শামসুদ্দোহা
পূর্ব বাংলার গভর্নর	চৌধুরী খালেকুজ্জামান	ঢাকার জেলা প্রশাসক	এ এইচ কোরাইশী সিএসপি
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন	ঢাকার পুলিশ সুপার	মোহাম্মদ ইদরিশ, পিএসপি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ, ১৯৭১ সালে ৩ মার্চের পূর্বঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। এর প্রতিবাদে ১ মার্চ, ১৯৭১ সালে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদ ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে জনসভার ঘোষণা দেয়। একই দিন (১ মার্চ) হোটেল পূর্বাণীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চের হরতালে বহুলোক হতাহত হয়। এর প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশের পর সকাল ১১ টায় আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে কলাভবনের বটতলায় মানচিত্র খচিত প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা করে।

অপারেশনসমূহ

অপারেশন ব্লিজ	১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অসহযোগিতা এবং সময়মতো ত্রাণ না পাঠানো এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উদাসীনতার কারণে জন-অসন্তোষ এবং আন্দোলন শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয় সেটি অপারেশন ব্লিজ। এটি অপারেশনের সার্চলাইটের পূর্বনাম।
অপারেশন সার্চলাইট	২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধন অভিযান।
অপারেশন বিগবার্ড	২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার অপারেশন।
অপারেশন কিলোফ্লাইট	কিলোফ্লাইট বিমান বাহিনীর একটি ফ্লাইং ইউনিট। এরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযান চালায়। চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে আক্রমণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হয় ৩ ডিসেম্বর রাতে।
অপারেশন জ্যাকপট	১০ নং সেক্টরের অধীনে নৌ কমান্ডোগণ দ্বারা পরিচালিত গেরিলা অভিযান। ১৫ আগস্ট, ১৯৭১ সালে মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরে একযোগে হামলা করে হানাদার বাহিনীর ২৬টি জাহাজ ধ্বংস করে এবং সমুদ্র পথগুলোকে নিরাপদ করে।
অপারেশন হট পেন্টস	১০ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নৌবাহিনীর পরিচালিত একটি অপারেশন যার মাধ্যমে বিএনএস পদ্মা ও পলাশ ব্যবহার করে মোংলা বন্দরের প্রবেশমুখ মাইন দ্বারা ধ্বংস করা এবং পাকিস্তানের জাহাজে হামলা করা।
অপারেশন চেঙ্গিস খান	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান কর্তৃক ভারতে পরিচালিত হামলা।
অপারেশন ক্যাকটাস লিলি	১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারতের সীমান্তে পাকিস্তানি হামলার জবাবে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনী একত্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে বিমান আক্রমণ চালায় তাকে অপারেশন ক্যাকটাস লিলি বলে।
অপারেশন ওমেগা	বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা এই তিন মহাদেশের একদল অহিংস সত্যাগ্রহী কর্তৃক ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির কোড নাম অপারেশন ওমেগা। এর উদ্যোক্তা রজার মুডি।
অপারেশন ক্লোজডোর	বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থাকা অস্ত্র জমা নেওয়ার কর্মসূচি/অভিযান।

স্বাধীনতার ইশতেহার

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, পল্টনে সমাবেশে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করে। এ ইশতেহারেই বাংলাদেশকে প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ৬ মার্চ প্রস্তাবটি সাংগঠনিকভাবে অনুমোদিত হয়। এ ইশতেহার পাঠ করেন শাহজাহান সিরাজ। এ ইশতেহারে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

ইশতেহারের লক্ষ্য ছিল ৩টি: ১. বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ। ২. বৈষম্যের নিরসন। ৩. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৭ মার্চের ভাষণ

৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল রোজ রবিবার, রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণই ৭ মার্চের ভাষণ হিসেবে পরিচিত। এ সভার একমাত্র বক্তা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

এ ভাষণে তিনি ৪টি দাবির কথা উল্লেখ করেন। যথা–

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার।
২. সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
৩. গণহত্যার তদন্ত করা।
৪. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

অপারেশন সার্চলাইট (২৫ মার্চ, ১৯৭১)

৭ মার্চের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। সর্বত্র শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং ১৬-২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গোলটেবিল বৈঠক করেন। ২২ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান অপারেশন সার্চলাইটের আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐ দিন ভুট্টোও ঢাকা ত্যাগ করেন। মুক্তিকামী বাঙালিদের দমন করার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পরিচালিত হয় সশস্ত্র অভিযান।

পরিকল্পনার কালানুক্রমিক ইতিহাস	অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করা হয় ১৮ মার্চ।
	গাজীপুরে সেনাদের নিরস্ত্রীকরণ করা হয় ১৯ মার্চ।
	চট্টগ্রাম বন্দর থেকে অস্ত্রখালাস করা হয় ২৪ মার্চ।
পরিকল্পনার খসড়া তৈরি	খাদিম হুসাইন রাজা ও রাও ফরমান আলী।
পরিকল্পনার তত্ত্বাবধায়ক	লে.জেনারেল টিক্কা খান।
অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব	ঢাকা অঞ্চলে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাও ফরমান আলীকে, আর বাকি পুরো প্রদেশে অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয় খাদিম হুসাইন রাজাকে।
অপারেশন পরিচালনা	পাকিস্তানি সৈন্যরা ১১.৩০ মিনিটে সেনানিবাস হতে বেরিয়ে এসে ফার্মগেটে মিছিলরত নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা করে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, নীলক্ষেত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও বর্তমান জহুরুল হক হলে) আক্রমণ চালায়।

২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া পাকিস্তান বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার প্রেক্ষিতে ২৬ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭ শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারো স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়। *[উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯-১০ম শ্রেণি), পৃ: ১৭০]*

প্রবাসী সরকার

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য প্রবাসী সরকার (Government-in-Exile) গঠনের চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ।' ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ' অনুযায়ী সেদিনই স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন করা হয়। এ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত হয়।

প্রবাসী সরকারের গঠন ও কাঠামো	
নাম	**পদমর্যাদা ও দায়িত্ব**
শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি –পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ–রাষ্ট্রপতি –শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।
তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী –প্রতিরক্ষা, তথ্য প্রচার এবং টেলিযোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাপন এবং প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	অর্থমন্ত্রী এবং জাতীয় রাজস্ব, শিল্প ও বাণিজ্য ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
এ এইচ এম কামারুজ্জামান	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
কর্নেল (অব.) এম. এ. জি ওসমানী	সেনাবাহিনীর প্রধান।
কর্নেল (অব.) আব্দুর রব	সেনাবাহিনীর উপপ্রধান-চিফ অব স্টাফ।
গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার	ডেপুটি চিফ অব স্টাফ।

প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ

- **শপথ অনুষ্ঠিত হয়:** ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১; সকাল ১১টায়।
- **শপথের স্থান:** কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ভবেরপাড়া এক আম বাগানে।
- **অনুষ্ঠান শুরু:** কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এরপর সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুজনই বক্তব্য পেশ করেন।
- **শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন:** আব্দুল মান্নান।
- **শপথ পাঠ করান:** অধ্যাপক ইউসুফ আলী (স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী)।
- **সদস্য:** ৬ জন।
- **মন্ত্রণালয়:** ১২ টি।
- **মন্ত্রী:** ৪ জন।
- **জাতীয় সংগীত পাঠ করেন:** শাহাবুদ্দিন আহমেদ সেন্টু।
- **গার্ড অব অনার প্রদান:** শপথ শেষে ঝিনাইদহের Sub Division Officer মাহবুব উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রথম ১২ জন আনসার গার্ড অব অনার প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে ৮ নং সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ৩৪ জন আনসার দ্বিতীয় বার গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

❑ **প্রবাসী সরকারের সচিবালয়:** ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।

প্রবাসী সরকারের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

নাম	দায়িত্ব	নাম	দায়িত্ব
আব্দুল মান্নান	তথ্য, বেতার ও প্রচার	মতিউর রহমান	বাণিজ্য বিষয়ক বিষয়াদি
অধ্যাপক ইউসুফ আলী	সাহায্য ও পুনর্বাসন	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক প্রধান
ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম	ভলেন্টিয়ার কোর	হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী	নয়াদিল্লিতে কূটনৈতিক মিশন প্রধান
ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী	পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান	এম. হোসেন আলী	কলকাতার মিশন প্রধান

সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বীকৃতি আদায়, রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধকে সর্বজনীন করা এবং মুজিবনগর সরকারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দিকনির্দেশনার জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন – আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি ন্যাপ ভাসানী), শ্রী মনি সিং (সভাপতি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ (সভাপতি ন্যাপ মোজাফফর), শ্রী মনোরঞ্জন ধর (সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস), তাজউদ্দিন আহমেদ (প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে) ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ (পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদাধিকারবলে)। *(সূত্র: ৯ম-১০ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)*

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

ঘোষণাপত্র জারি	১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
কার্যকর	২৬ মার্চ, ১৯৭১ থেকে ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সাল।
স্বাক্ষর	অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলী, বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।
খসড়া লেখক	ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম।

এটি বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সংবিধান। কারণ সংবিধানে যেমন রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের বর্ণনা, রাষ্ট্রের লক্ষ্য, সরকার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের কাঠামোর সার্বিক দিক আলোচনা করা হয় তেমনি এই ঘোষণাপত্রেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়, এ ঘোষণাপত্রে সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল যেখানে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, করারোপ, অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা এবং ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ছিল। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি এসকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত। এখানে রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

তেলিয়াপাড়া রণকৌশল

মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত এসেছিল গোপন এক বৈঠক থেকে। তাতে অংশ নেন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ২৭ জন সেনা কর্মকর্তা। বৈঠকটি হয়েছিল ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা–বাগান ব্যবস্থাপকের বাংলোতে।

ঐতিহাসিক ওই বৈঠকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (এম এ জি ওসমানী)। তিনি ভারতের আগরতলা থেকে এসে ওই বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন কর্নেল এম এ রব, মেজর সি আর দত্ত, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম সফিউল্লাহ, লে. কর্নেল সালাউদ্দীন মোহাম্মদ রেজা, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন নাসিম, লে. সৈয়দ ইব্রাহীম প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডার

১০ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই, ১৯৭১ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন -১৭ জন।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্টর কমান্ডারগণ

সেক্টর	অঞ্চল	সদর দপ্তর	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার
১	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফেনী নদী পর্যন্ত	হরিণা, ত্রিপুরা	মেজর জিয়াউর রহমান (১০ এপ্রিল থেকে ১০ জুন)
			মেজর রফিকুল ইসলাম (১০ জুন থেকে ১৬ ডিসেম্বর)
২	নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকার অংশবিশেষ	মেলাঘর, ত্রিপুরা	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর)
			মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর)
৩	সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ	হেজামারা, ত্রিপুরা	মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ (২৬ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর)
			মেজর এ.এন.এম. নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর)
৪	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত	প্রথমে করিমগঞ্জ, পরবর্তীতে মাছিমপুর, আসাম	মেজর সি. আর. দত্ত (এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর)
৫	সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল।	বাঁশতলা, সুনামগঞ্জ	মেজর মীর শওকত আলী (এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর)
৬	সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা	বুড়িমারী, পাটগ্রাম	উইং কমান্ডার মো: খাদেমুল বাশার (এম কে বাশার)
৭	দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা	তরঙ্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ	মেজর নাজমুল হক (দুর্ঘটনায় নিহত হন)
			মেজর কাজী নূরুজ্জামান
৮	কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা, দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ ও মুজিবনগর	কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল থেকে আগস্ট)
			মেজর এম. এ. মঞ্জুর (জুলাই থেকে ডিসেম্বর)
৯	দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা	টাকি, বসিরহাট, ভারত	মেজর এম. এ. জলিল (জুন থেকে ডিসেম্বর)
			মেজর জয়নাল আবেদীন
			মেজর এম. এ. মঞ্জুর
১০	৫১৫ জন নৌবাহিনী কমান্ডোর অধীন। শত্রুপক্ষের নৌযান ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো	-	হেড কোয়ার্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নৌ কমান্ড বাহিনী গঠিত হয়। এ সেক্টরে কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না
১১	কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি–আরিচা থেকে ফুলছড়ি–বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল	মহেন্দ্রগঞ্জ, আসাম	মেজর জিয়াউর রহমান (জুন থেকে আগস্ট)
			মেজর আবু তাহের (আগস্ট থেকে নভেম্বর)
			ফ্লাইট লে. এম. হামিদুল্লাহ খান (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর)

১ নং সেক্টরের সাবসেক্টর ছিল ৫টি, ২নং সেক্টরের সাব সেক্টর ছিল ৬টি, ৩নং-এ ১০টি, ৪-এ ৬টি, ৫নং-এ ৬টি, ৬নং-এ ৫টি, ৭নং-এ ৮টি, ৮নং-এ ৭টি, ৯নং-এ ৩টি এবং ১১নং-এর ছিল ৮টি সাবসেক্টর। অর্থাৎ আমাদের মহান ও বীরোচিত মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ও সাবসেক্টর মিলিয়ে সংখ্যা ছিল ৭৫টি (১১ + ৬৪)।

মুক্তিযুদ্ধে ১০নং সেক্টর: এ সেক্টর গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাকিস্তান নৌবাহিনীর আটজন বাঙালি নৌ-কমান্ডার। এরা ছিলেন চীফ পোস্ট অফিসার গাজী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, পোস্ট অফিসার মোশাররফ হোসেন, পোস্ট অফিসার আমানউল্লাহ শেখ, এম. ই. আহসানউল্লাহ, আর ও ১-এর আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, এম ই-১ এর বদিউল আলম, ই-এন ১-এর আব্দুর রকিব মিয়া এবং স্টুয়ার্ট-১ এর আবদুর রহমান আবেদ। আটজন বাঙালি নৌ সেনা ফ্রান্সে সফররত পাকিস্তানি সাবমেরিন পরিত্যাগ করে চলে আসেন। তাদের অংশগ্রহণে বাছাই করা ৩৫৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীতে প্রশিক্ষণ নেয়। তারা চট্টগ্রাম, মোংলা বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরে দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাভিযান – ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে চট্টগ্রাম বন্দরে ১৭টি পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংস করেছিল। নৌকমান্ডো বাহিনীর সরাসরি প্রধান সেনাপতির অধীন ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার নানান সব অভিনব সামরিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল এ ১০নং সেক্টরে।

- টাইগার লিডার খ্যাত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন – মেজর মীর শওকত আলী (৪ নং সেক্টর)।
- যে সেক্টর কমান্ডার কোনো খেতাব পাননি – মেজর আব্দুল জলিল (৯ নং সেক্টর), রাজনৈতিক কারণে।
- যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধাঞ্চলে বিভক্ত করে। এই ৪টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন –

চট্টগ্রাম অঞ্চল	মেজর জিয়াউর রহমান
কুমিল্লা অঞ্চল	মেজর খালেদ মোশাররফ
সিলেট অঞ্চল	মেজর কে এম সফিউল্লাহ
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বিভক্ত করে রাজশাহী অঞ্চলে মেজর নাজমুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলে মেজর নওয়াজেস উদ্দিন এবং খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যদের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার অদম্য বাসনায় ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' গঠন করে।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল।

নিয়মিত বাহিনী

মুক্তিবাহিনীর 'নিয়মিত বাহিনী' গঠন করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (EBR), ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা BGB), পুলিশ, অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং সাধারণ জনগণ নিয়ে। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম-এফ (মুক্তিফৌজ)।

নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল

- **সেক্টর ট্রুপস:** প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক সেক্টরের জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করেন।
- **ব্রিগেড ফোর্স:** দেশের রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয় এবং ব্রিগেড ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে।

ব্রিগেড ফোর্স

❑ জেড ফোর্স

জেড ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এর সদর দপ্তর ছিল তেলঢালা। মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড জেড ফোর্স ৭ জুলাই, ১৯৭১ সালে গঠিত হয়। লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় জেড ফোর্স। তিনটি নিয়মিত বাহিনী প্রথম তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ান এর সমন্বয়ে এই ফোর্স গঠিত হয়। এই ফোর্সের যুদ্ধস্থল ছিল কামালপুর, বাহাদুরাবাদ, চিলমারী, গোবিন্দগঞ্জ এলাকায়।

প্রশ্ন-১৫ : মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার প্রথম বার্তা এখান থেকে প্রচারিত হলে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু বেতার কেন্দ্রে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ছড়িয়ে পরে। বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকদের ক্ষুরধার প্রচার এবং অনুষ্ঠানসমূহ মুক্তিযোদ্ধাদের ও সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে অনুপ্রেরণা, সাহস ও মনোবল জুগিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ও রণাঙ্গনগুলো এবং শত্রু কবলিত এলাকার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, শরণার্থীদের দু:সহ জীবন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-১৬ : তেলিয়াপাড়া রণকৌশল কী?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্র হয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন, মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা এবং মুক্তিযুদ্ধকে একজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের নেতৃত্বে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখানে অংশগ্রহণ করেন মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী, মেজর কে.এম শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর সাফায়াত জামিল, মেজর সি. আর দত্ত, প্রমুখ।

প্রশ্ন-১৭ : প্রবাসী সরকার গঠনের জন্য মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল?

উত্তর : বৈদ্যনাথতলা বেছে নেওয়ার কারণ –

- এখানে আক্রমণ করতে হলে পাক বাহিনীকে ভারতীয় আকাশ সীমা অতিক্রম করতে হতো।
- আক্রান্ত হলেও সহজেই ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করার সুযোগ ছিল।
- বিদেশি সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৮ : প্রবাসী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে নারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন কে?

উত্তর : প্রবাসী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে নারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন বেগম নাজিয়া ওসমান চৌধুরী।

প্রশ্ন-১৯ : ক্র্যাক প্লাটুন কী?

উত্তর : ক্র্যাক প্লাটুন একটি গেরিলা সংগঠন। এর সদস্যরা তরুণ যুবক। এরা ঢাকা শহরে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। Hit and Run পদ্ধতিতে এরা আক্রমণ চালাতো। মেজর খালেদ মোশাররফের তত্ত্বাবধানে এরা পরিচালিত হতো।

প্রশ্ন-২০ : ক্র্যাক প্লাটুনের কয়েকজন সদস্যের নাম বলুন।

উত্তর : ১. পপ সম্রাট আজম খান, ২. মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ৩. গোলাম দস্তগীর গাজী, ৪. নাছির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, ৫. বদিউল আলম বদি, ৬. শহিদ শাফি ইমাম রুমী, ৭. রাইসুল ইসলাম আসাদ, ৮. শহিদ জুয়েল, ৯. শহিদ মাগফার আহমেদ চৌধুরী আজাদ, ১০. শহিদ বদিউজ্জামান প্রমুখ।

প্রশ্ন-২১ : ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দলিলের নাম কী ছিল? এতে কে কে স্বাক্ষর করেন?

উত্তর : Instrument of Surrender. এর লেখক ছিলেন ভারতের পূর্বাঞ্চল বাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ জে.এফ.আর জ্যাকব (জেনারেল-ফারজ-রাফায়েল জ্যাকব)। এই দলিলে স্বাক্ষর করেন মিত্র বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি (এ.এ.কে নিয়াজি)। বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন এ কে খন্দকার।

প্রশ্ন-২২ : নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা কারা?

উত্তর : অধ্যাদেশ অনুযায়ী, 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ যারা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং যে সব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

লিপ্ত হয়ে হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের এই দেশীয় সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন— এইরূপ সব বেসামরিক নাগরিক উক্ত সময়ে যাদের বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন বয়সের মধ্যে; এবং সশস্ত্র বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই.পি.আর), পুলিশ বাহিনী, মুক্তি বাহিনী, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) ও উক্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য বাহিনী, নৌ কমান্ডো, কিলো ফোর্স, আনসার সদস্য এবং বাংলাদেশের নিম্নবর্ণিত নাগরিকরাও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা-

ক) যে সকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খ) হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত সব নারী (বীরাঙ্গনা)।

গ) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী ফিল্ড হাসপাতালের সব ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা-সহকারী।

প্রশ্ন-২৩ : নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা কারা?

উত্তর :

i) যেসব বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন এবং যে সব বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন;

ii) যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দূত এবং ওই সরকারের নিয়োগ করা চিকিৎসক, নার্স বা অন্যান্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন;

iii) মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সঙ্গে সম্পৃক্ত সব এমএনএ বা এমপিএ; এবং যারা পরে গণপরিষদের সদস্য গণ্য হয়েছিলেন;

iv) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সব শিল্পী ও কলাকুশলী এবং দেশ ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সব বাংলাদেশি সাংবাদিক;

v) স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল।

প্রশ্ন-২৪ : যুদ্ধশিশু কী?

উত্তর : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাবস্থার সুযোগে পাকিস্তানে সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী দুর্বৃত্তদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার পর বাঙালি বীরাঙ্গনারা যেসকল শিশুর জন্ম দেন তাদেরকে যুদ্ধশিশু বলা হয়। সিরাজগঞ্জের তাড়াশের মেরিনা খাতুনকে 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয় জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল। যুদ্ধশিশুদের দত্তক গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেন কানাডা। অন্যান্য দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়া এ দত্তকের সাথে সম্পৃক্ত হয়। বাংলাদেশের প্রথম দত্তক যুদ্ধ শিশু জয় নিকলাস।

প্রশ্ন-২৫ : মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : ক. মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র প্রদান, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, রিক্রুটিং, শরণার্থী শিবিরের পরিচালনায় মহিলা ও ছাত্রীরা সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

খ. মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে প্রায় ২ লক্ষ মা বোন ধর্ষণের শিকার হন।

গ. পাক সেনা ও তাদের দোসরদের অবস্থানের খবর, গোপন আস্তানার খবর, তাদের পরিকল্পনা, ঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র সেনা সংখ্যা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সরবরাহ করতো।

ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতার গোবরায় নারীরা সশস্ত্র ট্রেইনিং নেয়। নারীরা গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়াডেও ট্রেইনিং নেয়।

ঙ. আহত মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য নাগরিকদের চিকিৎসা সেবায় নারীরা অবদান রাখেন।

চ. প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে নারীরা কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেন।

ছ. সাংস্কৃতিক কাজে ড. সানজিদা খাতুনের ছায়ানট ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারী শিল্পীদের দেশাত্মবোধক গানগুলো অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচলিত আইনসমূহ

দণ্ডবিধি (১৮৬০)/Penal Code 1860

প্রারম্ভিক আলোচনা

দণ্ডবিধি (Penal Code) অপরাধ সংক্রান্ত একটি মৌলিক বা তত্ত্বগত আইন। এই আইনে বিভিন্ন অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, অপরাধ সংঘটনের বিভিন্ন উপাদান এবং শাস্তির পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সেগুলোর বিচারের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়নি। দণ্ডবিধির অধীন অপরাধসমূহ কীভাবে বিচার করা হবে তা দণ্ড সম্পর্কিত পদ্ধতিগত আইন, ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দণ্ডবিধির মোট ধারা ৫১১টি।

দণ্ড

দণ্ডবিধির ধারা ৫৩ তে ৫ প্রকার দণ্ডের বা শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যথা-

১. মৃত্যুদণ্ড, ২. যাবজ্জীবন কারাবাস, ৩. কারাবাস [(ক) সশ্রম ও (খ) বিনাশ্রম], ৪. সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও ৫. অর্থদণ্ড।

যাবজ্জীবন কারাবাস

যাবজ্জীবন কারাবাস অর্থ অবশিষ্ট জীবনব্যাপী সশ্রম কারাবাস। সম্প্রতি ***Ataur Mridha v. State*** মামলায় আপিল বিভাগ যাবজ্জীবন কারাবাসকে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন –

Life imprisonment means a sentence of rigorous imprisonment for the whole of the remaining period of the convicted person's natural life. [যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো একজন দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের অবশিষ্ট জীবনব্যাপী সশ্রম কারাবাস]

শুধু দণ্ডবিধির ধারা ৫৫, ৫৭ ও ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫ক ধারায় ব্যবহৃত যাবজ্জীবন কারাবাস বলতে ৩০ বৎসর গণ্য হবে বা যেক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাবাসকে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে রূপান্তর করতে হয় সেক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাবাসকে ৩০ বৎসর মর্মে ধরতে হবে। আর যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত বা আমৃত্যু পর্যন্ত কারাবাস দেওয়া হয়, যেমন The International Crimes Tribunal কর্তৃক প্রদত্ত কোনো শাস্তি (যাবজ্জীবন), সেক্ষেত্রে দণ্ডিত আসামি ৩৫ক ধারার সুবিধা পাবে না এবং তার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাবাস ৩০ বৎসর হিসাবে গণ্যও হবে না বরং তাকে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত কারাভোগ করতে হবে।

শিশু কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কার্য

- ৯ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না। [ধারা – ৮২]
- ৯ বৎসরের অধিক কিন্তু ১২ বৎসরের কম বয়স্ক অপরিণত বোধশক্তিসম্পন্ন শিশুর কাজ কোনো অপরাধ নয়। [ধারা – ৮৩]

ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার

শরীরের ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার কখন মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে তা ১০০ ধারায় বলা হয়েছে এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার কখন মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে তা ১০৩ ধারায় বলা হয়েছে।

- যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য:

ধারা ১০০ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ৬ (ছয়টি) ক্ষেত্রে শরীরের ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত বিস্তৃত। যথা:

১. এমন আক্রমণ যা মৃত্যু ঘটানোর যুক্তিসংগত আশঙ্কা সৃষ্টি করে;
২. এমন আক্রমণ যা গুরুতর জখমের যুক্তিসংগত আশঙ্কা সৃষ্টি করে;
৩. ধর্ষণের অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ;
৪. অপ্রকৃত কাম লালসার অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ;
৫. মনুষ্যহরণ বা অপহরণের অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ;
৬. অবৈধভাবে আটকের অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ।

১০৩ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যাবে। যথা:

১. দস্যুতা;
২. রাত্রি বেলায় অপথে গৃহে প্রবেশ;
৩. বাসগৃহে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত স্থানে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধন;
৪. চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহপ্রবেশের ভীতি।

রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ সম্পর্কিত দণ্ডবিধির ধারাসমূহ

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১২১	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা বা যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা করা	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড
১২১ক	বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে অবস্থান করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ বা যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা করা অপরাধসমূহের ষড়যন্ত্র করা	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১২২	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহকরণ	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১২৪ক	রাষ্ট্রদ্রোহিতা (Sedition)	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১২৫	বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ কোনো এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ বা যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা করা	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বেআইনি সমাবেশ সম্পর্কিত দণ্ডবিধির ধারাসমূহ

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১৪৩	বেআইনি সমাবেশের সদস্য হওয়া	৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড
১৪৪	মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনি সমাবেশে যোগদান করা	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড
১৪৫	কোনো বেআইনি সমাবেশ ভঙ্গ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও উক্ত সমাবেশে যোগদান বা অবস্থান করা	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড
১৫৩খ	রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র প্রভৃতিকে প্ররোচিত করা	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড

দাঙ্গা সম্পর্কিত দণ্ডবিধির ধারাসমূহ

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১৪৭	দাঙ্গা	২ (দুই) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
১৪৮	মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গা	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
১৬০	মারামারি (Affray)	১ (এক) মাস কারাদণ্ড অথবা ১০০ টাকা জরিমানা

সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কিত দণ্ডবিধির ধারাসমূহ

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১৬১	সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়ই
১৬২	কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুষ গ্রহণ	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়ই

নিন্দনীয় নরহত্যা এবং খুনের শাস্তি সম্পর্কিত দণ্ডবিধির ধারাসমূহ

ধারা	অপরাধ	নির্ধারিত শাস্তি
৩০২	খুনের শাস্তি	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড
৩০৩	যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুনের শাস্তি।	মৃত্যুদণ্ড।
৩০৪	খুন বলে গণ্য নয় এমন নিন্দনীয় অপরাধজনক নরহত্যা শাস্তি।	মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় নিয়ে নরহত্যা করলে সেই ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
		মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় ব্যতীত কিন্তু জ্ঞাত আছে যে এমন কার্য সম্ভবত মৃত্যু ঘটাবে বা এমন শারীরিক জখম ঘটাবে যা সম্ভবত মৃত্যু ঘটাবে, তাহলে ১০ (দশ) বছরের কারাদণ্ড।

পাকিস্তানের নতুন সুলতান

ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির 'আহমেদ শাহ পাকিস্তানে বর্তমানে সবচেয়ে বড় VIP'র নাম। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তিনি আরও ক্ষমতাধর হয়ে উঠেন। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি তিনি এখন দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীরও (CDF) প্রধান। এখন তিনি পাকিস্তানের সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত আইনের উর্ধ্বে থাকা একজন ব্যক্তি। কোরআনে হাফেজ এই সেনা কর্মকর্তা চার তারকা জেনারেল থেকে পাঁচ তারকা ফিল্ড মার্শাল, সেনাপ্রধান থেকে Chief of Defence Forces (CDF) বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হয়েছেন।

পর্তুগালের নতুন প্রেসিডেন্ট

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার (রান-অফ) ভোটে কট্টর ডানপন্থি আন্দ্রে ভেনচুরাকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী হন সমাজতান্ত্রিক নেতা আন্তোনিও হোসে সেগুরো। ১৮ জানুয়ারি প্রথম দফা এবং দ্বিতীয় দফা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্তুগালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৯৭% ভোট কাস্ট করা হয়। কাস্টকৃত এই ভোটের ৬৬.৮% পান সেগুরো। অন্যদিকে ৩৩.২% পান ভেঞ্চুরা।

সাম্প্রতিক আলোচিত বিষয়াবলি

গোল্ডেন ডোম (Golden Dome)

গোল্ডেন ডোম হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত একটি অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি মূলত একটি মাল্টি-লেয়ার্ড সিস্টেম যা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র যেমন-ব্যালিস্টিক, হাইপারসনিক এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, শনাক্ত ও ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সেন্সর এবং স্পেস-ভিত্তিক ইন্টারসেপ্টরসহ স্যাটেলাইটের একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হবে। এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে রক্ষা করা। এই সিস্টেমের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে উৎক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্রও প্রতিহত করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

গোল্ডেন ডোম প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. **মাল্টি-লেয়ার্ড সিস্টেম:** এই ব্যবস্থায় একাধিক প্রতিরক্ষা স্তর থাকবে, যা বিভিন্ন উচ্চতা এবং পরিসরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম।
২. **সেন্সর ও ইন্টারসেপ্টর:** এতে উন্নত সেন্সর এবং স্পেস-ভিত্তিক ইন্টারসেপ্টর ব্যবহার করা হবে, যা ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্তকরণ ও ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
৩. **স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক:** গোল্ডেন ডোমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য স্যাটেলাইটের একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে।
৪. **মহাকাশ-ভিত্তিক ইন্টারসেপ্টর:** এই ব্যবস্থায় মহাকাশে ইন্টারসেপ্টর স্থাপন করা হবে, যা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবিলা করতে পারবে।
৫. **আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা:** গোল্ডেন ডোম শুধু ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করবে না, বরং সম্ভাব্য শত্রুদেরকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে বিরত রাখতেও সহায়তা করবে।

বিশ্বের প্রথম AI হাসপাতাল

বিশ্বে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক হাসপাতাল চালু করেছে চীন। যেখানে কাজ করছেন ১৪ জন AI চিকিৎসক। ৩ মে ২০২৫ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন উদ্যোগের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে হাসপাতালটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিশালী AI প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল ও চিকিৎসা শাখার সমন্বিত দক্ষতা ব্যবহার করা হবে। বেইজিংয়ের সিংহুয়া চাংগুং হাসপাতাল ও এর অধিভুক্ত ইন্টারনেট হাসপাতালে এ ব্যাপারে প্রাথমিক পাইলট কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে, যার মধ্যে জেনারেল প্র্যাকটিস, চক্ষুবিদ্যা, রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনস্টিক ও রেসপিরেটরি মেডিসিনসহ বিভিন্ন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দীর্ঘমেয়াদে এর লক্ষ্য হলো আধুনিক-সাশ্রয়ী ও টেকসই স্বাস্থ্যসেবা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তাইওয়ানের ডিজিটাল নোম্যাড ভিসা

২০২৫ সালের শুরু থেকেই **'ডিজিটাল নোম্যাড' বা যাযাবর ভিসা** দেওয়া শুরু করে **তাইওয়ান**। বিদেশিদের দেওয়া ছয় মাস মেয়াদি এই ভিসা প্রযুক্তিতে তাদের নিজস্ব প্রতিভার ঘাটতি কমাতে সহায়তা করবে। ২০৩২ সালের মধ্যে দেশে চার লাখ বিদেশি কর্মী আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাইওয়ান। অন্য দেশ থেকে আসা কর্মীদের নোম্যাড ভিসায় ছয় মাস কাজ করার সুযোগ দেবে দেশটি। এরই মধ্যে ডিজিটাল যাযাবর পেশায় পরিবেশের দিক থেকে এশিয়ার সেরা দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় তাইওয়ান।

6G'র যুগে বিশ্ব

বিশ্বে 5G প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী সংযোগের জন্য সবচেয়ে উন্নত হলেও এবার বিশ্বের প্রথম 6G ডিভাইস তৈরি করে জাপান। এটি একটি প্রোটোটাইপ, যা ৩০০ ফুটেরও বেশি দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ জিবিপিএস গতিতে ডেটা প্রেরণ করতে পারে। এটি বর্তমান 5G প্রযুক্তির তুলনায় ২০ গুণ উন্নত বলে দাবি করা হয়। 6G প্রোটোটাইপ ১০০ গিগাহার্জ ব্যান্ড ব্যবহার করে ১০০ জিবিপিএস পর্যন্ত গতি অর্জন করতে পারে।

উইকিমিডিয়া

উইকিপিডিয়ার সাহায্যে লিখিত জ্ঞানের পাশাপাশি ছবি, অডিও বা ভিডিও থেকেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। সেই ধারণা থেকে জন্ম নেয় উইকিমিডিয়া কমন্স, উইকিডেটা, উইকিভয়েজ, উইকিস্পেসিসের মতো উইকিপিডিয়ার অনেকগুলো সহ-প্রকল্প। উইকিমিডিয়া আন্দোলনের একটি প্রকল্প উইকিপিডিয়া। এছাড়াও রয়েছে-উইকিকোট, উইকিবুকস, উইকিনিউজ, উইকিসোর্স, উইকিভার্সিটি, উইকিশোনারি, মিডিয়াউইকি ও মেটা-উইকি। ২০ জুন ২০০৩ উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা মানুষের সমস্যা সমাধানের মতো গুণাবলিকে কম্পিউটার বা মেশিনের মাধ্যমে অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

AI এ প্রথম-

- সিইও: মিকা (পোল্যান্ডের ডিকটেডর কোম্পানি)
- বিমান বালা: সামা ২.০ (কাতার এয়ারওয়েজ)
- শিশু: টং টং (চীন)
- সুন্দরী: কেনেজা লাইলি (মরক্কো)
- নারী সংবাদ পাঠিকা: জিন জিয়াওমেং (চীন)
- AI দিয়ে ছাপা পত্রিকা: ইল ফোইও (ফ্রান্স)

প্রথম হাইব্রিড কোয়ান্টাম সুপার কম্পিউটার

সম্প্রতি জাপানে বিশ্বের প্রথম হাইব্রিড কোয়ান্টাম সুপারকম্পিউটার চালু হয়। ২০-কিউবিটের এই কোয়ান্টাম কম্পিউটারের নাম 'রেইমেই'। দ্রুতগতির দিক থেকে পৃথিবীর ৬ষ্ঠ সুপারকম্পিউটার 'ফুগাকু'র সঙ্গে একে জুড়ে দেওয়া হয়। নতুন এ হাইব্রিড সুপারকম্পিউটার প্রচলিত সুপারকম্পিউটারের চেয়ে জটিল হিসাব করতে পারবে আরও দ্রুততম সময়ে। টোকিওর রিকেন সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউটে এটি স্থাপন করা হয়েছে। রেইমেই নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'কোয়ান্টিনুম' এবং 'রিকেন সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউট' যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন গবেষণার জন্য এটি ব্যবহার করা হবে।

AIVS

Automated Information and Verification System (AIVS) হলো দ্রুততম সময়ে একজন ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করার জন্য নতুন একটি প্রযুক্তি। এই সিস্টেমের মাধ্যমে মূলত বহনযোগ্য একটি ডিভাইসের মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় থাকা কোনো ব্যক্তির আঙুলের ছাপ, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর বা জন্ম তারিখের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়।

ব্রেন ড্রেইন

ব্রেন ড্রেইন বলতে বোঝায় একটি দেশ থেকে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ পেশাজীবীদের- যেমন ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, আইটি বিশেষজ্ঞ বা গবেষকদের-ব্যাপক আকারে অন্য দেশে চলে যাওয়া, যেখানে তারা উন্নত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। সহজভাবে বলতে গেলে, ব্রেন ড্রেইন হলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে মেধা ও দক্ষ মানবসম্পদের চলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া।

যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর

ইউক্রেনের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদকে যৌথভাবে কাজে লাগাতে ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এ চুক্তির আওতায় উভয় দেশ মিলে একটি পুনর্গঠন বিনিয়োগ তহবিল (Reconstruction Investment Fund) গঠন করবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সরঞ্জাম সহায়তা দেয়, এই পুনর্গঠন বিনিয়োগ তহবিল গঠনের মাধ্যমে তা স্বীকৃতি পাবে। ইউক্রেনের ভূগর্ভে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তালিকাভুক্ত ৩৪টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের মধ্যে অন্তত ২২টির সম্ভাব্য মজুত। এর মধ্যে রয়েছে লিথিয়াম, টাইটানিয়াম, নিকেল, গ্রাফাইট, জিরকোনিয়াম, কপার ও বিরল মৃত্তিকা উপাদান (খনিজ)। ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ সম্পদের জন্য চুক্তির প্রধান কারণ দেশটি চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে চায়। বর্তমানে চীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিরল খনিজ প্রক্রিয়াজাত করে।

বিভিন্ন সূচক/রিপোর্ট

সূচক/রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য	সূচক/রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য
হেনলি পাসপোর্ট সূচক- ২০২৬	▪ শীর্ষ দেশ: সিঙ্গাপুর। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: আফগানিস্তান। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ৯৩তম।	মানব উন্নয়ন সূচক- ২০২৫	▪ প্রকাশক- 'The United Nations Development Programme' (UNDP). ▪ শীর্ষ দেশ: আইসল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: দক্ষিণ সুদান। ▪ বাংলাদেশ: ১৩০তম।
সামরিক শক্তি প্রতিবেদন- ২০২৬	▪ শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: ভুটান। ▪ বাংলাদেশ: ৩৭তম।	বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি ২০২৫	▪ রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ আমদানিতে শীর্ষ দেশ: ইউক্রেন।
২৯তম ইথনোলগ রিপোর্ট- ২০২৬ (ভাষা)	▪ **বিশ্বে মোট প্রচলিত ভাষা:** ৭১৭০টি। ▪ সর্বাধিক ভাষার দেশ: পাপুয়া নিউগিনি। ▪ সর্বনিম্ন ভাষার দেশ: উত্তর কোরিয়া (মাত্র ১টি)। ▪ সর্বাধিক বিদেশি ভাষার ব্যবহার হয়: যুক্তরাষ্ট্রে। ▪ সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা: ইংরেজি (বাংলা-৭ম)। ▪ মাতৃভাষার বিবেচনায় ১ম: মান্দারিন (বাংলা ভাষার অবস্থান- ৫ম)।	**World Happiness Report-2025**	▪ প্রকাশক: Sustainable Development Solutions Network (SDSN). ▪ শীর্ষ দেশ: ফিনল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: আফগানিস্তান। বাংলাদেশের অবস্থান: ১৩৪তম।
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২৫	▪ প্রকাশক- 'The Heritage Foundation' (USA). ▪ শীর্ষ দেশ: সিঙ্গাপুর। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: উত্তর কোরিয়া। ▪ বাংলাদেশ: ১২২তম।	বিশ্ববাণিজ্য পরিসংখ্যান- ২০২৫	▪ প্রকাশক: WTO. ▪ বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন। ▪ বৈশ্বিক আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র।
বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন- ২০২৫	▪ প্রকাশক: জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (UNCTAD). ▪ বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র।	AI প্রস্তুতি সূচক- ২০২৪	▪ সর্বোচ্চ দেশ: সিঙ্গাপুর। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: দক্ষিণ সুদান। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১১৩তম।
বৈশ্বিক জনসংখ্যা সূচক- ২০২৫	▪ জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ: ভারত। ▪ জনসংখ্যায় সর্বনিম্ন দেশ: ভ্যাটিকান সিটি। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ৮ম।	**Richest countries in the world by GDP per capita in 2024**	▪ মাথাপিছু জিডিপিতে বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশ: লুক্সেমবার্গ।
বৈশ্বিক টেকসই প্রতিযোগিতামূলক সূচক- ২০২৫	▪ শীর্ষ দেশ: ফিনল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: দক্ষিণ সুদান। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১১৪তম।	বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন-২০২৪	▪ প্রকাশক: আইকিউএয়ার (সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান)। ▪ বায়ু দূষণে শীর্ষ দেশ: শাদ। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ২য়। ▪ নগর হিসেবে দূষণের দিক থেকে ঢাকার অবস্থান: ৩য় (১ম- দিল্লি)। ▪ বাংলাদেশের প্রতি ঘন মিটার বায়ুতে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার (পি এম ২.৫) উপস্থিতি ৭৮ মাইক্রোগ্রাম।
বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক ২০২৫	▪ শীর্ষ দেশ: সুইজারল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: নাইজার। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১০৬তম।	পর্যটকদের জন্য নিরাপদ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শহর	▪ নিরাপদ শহর: সিঙ্গাপুর সিটি। ▪ ঝুঁকিপূর্ণ শহর: কারাকাস (ভেনেজুয়েলা)। ▪ ঝুঁকিপূর্ণ শহরে ঢাকার অবস্থান: ষষ্ঠ।

পদক ও পুরস্কার

অস্কার পুরস্কার-২০২৬

চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার হলো অস্কার পুরস্কার। এর অন্য নাম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। ১৫ মার্চ, ২০২৬ সালে একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (অস্কার) ৯৮তম আসরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এবারের উল্লেখযোগ্য বিজয়ী-

চলচ্চিত্র	ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
পরিচালক	পল টমাস অ্যান্ডারসন
অভিনেতা	মাইকেল বি জর্ডান (সিনার্স)
অভিনেত্রী	জেসি বাকলি
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র	সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু

নোবেল পুরস্কার-২০২৫

ঐতিহ্যগতভাবে প্রতি বছরের অক্টোবরের প্রথম সোমবার নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা শুরু হয়। ১ম দিন চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল বিজয়ীর নাম এবং পরের সোমবার অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

পুরস্কার: প্রত্যেক বিভাগের নোবেলজয়ী পাবেন একটি মেডেল, একটি সনদপত্র এবং ১১ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা। কোনো বিভাগে একাধিক ব্যক্তি মনোনীত হলে আর্থিক পুরস্কার তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু দিবসে। ২০২৫ সালে মোট নোবেল বিজয়ী ১৪ জন ব্যক্তি। তাদের মধ্যে পুরুষ ১২ জন ও নারী ২জন।

নোবেল বিজয়ীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-

ক্ষেত্র	বিজয়ীদের নাম	দেশ	অবদান
চিকিৎসা	ম্যারি ই. ব্রাঙ্কো (নারী)	যুক্তরাষ্ট্র	পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স নিয়ে গবেষণার জন্য।
	ফ্রেড রামসডেল		
	শিমন সাকাগুচি	জাপান	
পদার্থবিজ্ঞান	জন ক্লার্ক	যুক্তরাজ্য	ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং ইলেকট্রিক সার্কিটে এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে গবেষণার জন্য।
	জন এম. মার্টিনিস	যুক্তরাষ্ট্র	
	মিশেল এইচ. ডেভোরেট	ফ্রান্স	
রসায়ন	সুসুমু কিতাগাওয়া	জাপান	মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কস (MOFs) উন্নয়নের গবেষণার জন্য।
	রিচার্ড রবসন	যুক্তরাজ্য	
	ওমর এম. ইয়াঘি	জর্ডান	
অর্থনীতি	জোয়েল মোকির	নেদারল্যান্ডস	প্রযুক্তির মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর গবেষণার জন্য।
	ফিলিপ আগিয়োঁ	ফ্রান্স	
	পিটার হাউইট	কানাডা	
শান্তি	মারিয়া কোরিনা মাচাদো (নারী)	ভেনেজুয়েলা	ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে ন্যায়সংগত ও শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের সংগ্রামের জন্য।
সাহিত্য	লাসলো ক্রাসনাহোরকাই	হাঙ্গেরি	আকর্ষণীয় এবং দূরদর্শী সাহিত্যকর্মের জন্য; যা অ্যাপোক্যালিপটিক (বিশ্ব বিধ্বংসী বা মহাবিপর্যয় সংক্রান্ত) আতঙ্কের মধ্যে শিল্পের শক্তিকে পুনর্ব্যক্ত করে।

৬৭তম র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার-২০২৫

র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার- ২০২৫ লাভ করেন ২ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান। এশিয়ার নোবেল খ্যাত 'র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার' ১৯৫৮ সাল থেকে ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট- র‍্যামন ম্যাগসেসে এর নামে প্রদান করা হয়।

বিজয়ী	দেশ
শাহিনা আলী	মালদ্বীপ
ফ্লাবিয়োনো আন্তোনিও ভিল্লানোভা	ফিলিপাইন
Educate Girls (NGO)	ভারত

আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার-২০২৫

- ১৯৬৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত মৌলিক ইংরেজি ভাষায় উপন্যাসের জন্য প্রতি বছর বুকার পুরস্কার দেওয়া হয়।
- এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০ পাউন্ড। ২০২৫ সালের ২০ মে আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার লাভ করেন ভারতের লেখিকা বানু মুশতাক। Heart Lamp ছোটগল্পের সংকলনের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। বইটির অনুবাদ করেছেন দিপা ভাস্তি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	আন্তর্জাতিক রাজনীতি
■ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধিক মাত্রায় অরাজনৈতিক।	■ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক।
■ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল কাজ।	■ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা।
■ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিধি অনেক বিস্তৃত।	■ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।
■ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৈশ্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।	■ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সর্বদা নিজ রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
■ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণভাবে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ধারণার সাথে সম্পর্কিত।	■ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতা ও সংঘাতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কিছু তত্ত্ব

ডোমিনো থিওরি

ডোমিনো থিওরি ১৯৫০'র দশক থেকে ১৯৮০'র দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্র নীতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেভিড আইজেন হাওয়ার এই তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। ডোমিনো তত্ত্বের মূলকথা ছিল, কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সমাজতন্ত্রীদের দখলে চলে যাবে। স্নায়ু যুদ্ধকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র মনে করতো যে Domino Effect বা Chain Reaction তত্ত্ব অনুযায়ী একটি অঞ্চলের কোনো একটি দেশ সমাজতন্ত্রের অধীনে গেলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোও সমাজতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। *[বি:দ্র: ডোমিনো হলো একটি খেলার নাম, খেলাটি অনেকটা কার্ড খেলার মতো তবে কার্ডের পরিবর্তে এখানে চতুষ্কোণ আকৃতির কিছু টাইল ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় ডোমিনো]* এই তত্ত্বের প্রভাবেই ASEAN গঠন করা হয়েছিল, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চীনের প্রভাব মুক্ত রাখার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল।

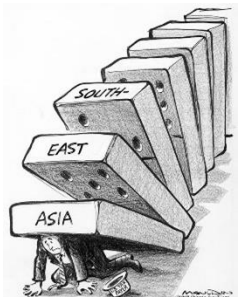

কার্টার থিওরি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ১৯৮০ সালের ২৩ জানুয়ারি কার্টার ডক্ট্রিন ঘোষণা করেন। কার্টার মতবাদ অনুযায়ী, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ওপর বাইরের কোনো শক্তি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে যুক্তরাষ্ট্র তার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে। মধ্যপ্রাচ্যে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পারস্য উপসাগর থেকে জ্বালানি তেলের নিরাপদ প্রবাহ রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে থাকে। কার্টার মতবাদ কার্যকর করতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়-

- Rapid Deployment Joint Task Force গঠন করে।
- পারস্য উপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতি বৃদ্ধি।
- মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সাথে সামরিক সহযোগিতা জোরদার করে।

হার্টল্যান্ড তত্ত্ব

১৯০৪ সালে Sir Halford Mackinder হার্টল্যান্ড তত্ত্ব প্রদান করেন। হার্টল্যান্ড তত্ত্বের মূলভাব হলো-যারা পূর্ব ইউরোপ শাসন করবে তারা হার্টল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করবে, যারা হার্টল্যান্ড শাসন করে তারা বিশ্বদ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করবে, যারা বিশ্বদ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করবে তারা পুরো পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে। এই তত্ত্বে সমুদ্র অঞ্চল নয় বরং স্থলভাগে নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

রিমল্যান্ড তত্ত্ব

নিকোলাস স্পাইকম্যান ১৯৪০ এর দশকে রিমল্যান্ড তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে হার্টল্যান্ডের চেয়ে ইউরেশিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো (Rimland) নিয়ন্ত্রণ করাই বিশ্বশক্তি অর্জনের মূল চাবিকাঠি। রিমল্যান্ড অঞ্চলটি ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটি শিল্প, জনসংখ্যা, বাণিজ্য ও সামরিক শক্তির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Balance of Power (শক্তির ভারসাম্য নীতি)

এটি একটি কূটনৈতিক কৌশল বা তত্ত্ব। একটি রাষ্ট্র যদি তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এরূপ কৌশল অবলম্বন করে, কিংবা করার চেষ্টা করে যাতে তার নিজের রাজনীতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক শক্তিকে আর কোনো রাষ্ট্র কিংবা কোনো শক্তি অতিক্রম করে যেতে না পারে তা হলে এই কৌশলকে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল বলা হয়। এই কৌশল অনুসারে যদি কোনো রাষ্ট্র তার চারপাশের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন অন্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে জোট তৈরি করে শক্তির ভারসাম্য তৈরি করে। ফলে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠা রাষ্ট্রটি আর দুর্বল কোনো রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন চালাতে পারে না।

শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

শক্তিগত ভারসাম্য সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। শক্তিগত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রধান কৌশল হলো সবল পক্ষের শক্তি হ্রাস বা দুর্বল পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে ভারসাম্য রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহের প্রয়োগ করা হয়। যেমন-

১. **মৈত্রীজোট সৃষ্টি:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার Grand Alliance গঠিত হয় নাৎসি জার্মানিকে মোকাবিলার জন্য।
২. **অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ:** প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রসমূহ অন্যরাষ্ট্রদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পরাশক্তিগুলোর মাঝে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে অনেকবারই নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Zero Sum Game (জিরো সাম গেম)

ফলিত গণিত বিষয়ের গেম থিওরি (Game Theory) থেকে উদ্ভূত জিরো সাম গেম ধারণাটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই তত্ত্ব দ্বারা এমন একটি পরিস্থিতিকে বুঝানো হয় যেখানে একজনকে জিততে হলে অন্য কাউকে হারতে হয়, একজনের লাভে অন্যজনের লোকসান হয়। একই রকমভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বাস্তববাদীরা মনে করেন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যেহেতু সীমিত তাই কোনো এক দেশ কিছু অর্জন করলে সেখানে অন্য দেশকে অবশ্যই লোকসান গুণতে হবে। গেইম থিওরির গাণিতিক গঠন দেখায় যে, এধরনের গেমে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যেখানে পরস্পরের ক্ষতি করাটাই সবচেয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। এটিই জিরো সাম গেম থিওরির মূল বক্তব্য।

Zero Zero Game (জিরো জিরো গেম)

সমস্যা সমাধানের দরকষাকষিতে কোনো পক্ষেরই ক্ষতি না হয়ে সমস্যার সমাধান হলে তাকে জিরো জিরো গেম (Zero-zero game) বলে। এর অন্য নাম Win-Win Situation। জিরো জিরো গেম তত্ত্বটি উদারতাবাদ নীতির সাথে সম্পৃক্ত।

পোড়ামাটি (Scorched Earth) নীতি

পোড়ামাটি নীতি হলো এক ধরনের সামরিক অভিযান বা কৌশল, যা প্রয়োগ করে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের সামরিক বেসামরিক জনগণকে হত্যার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। এ বর্বরতা থেকে রেহাই পায় না খাদ্যের উৎস, পানির সরবরাহ, পরিবহণ, যোগাযোগ ও শিল্পকারখানা। মোট কথা, প্রতিপক্ষের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়ার অভিযানের নামই হলো পোড়ামাটি নীতি। সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জাতিগত নির্মূল অভিযানে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানেরও একই নীতি ছিল।

বিখ্যাত কিছু ডকট্রিন ও পলিসি

মনরো ডকট্রিন

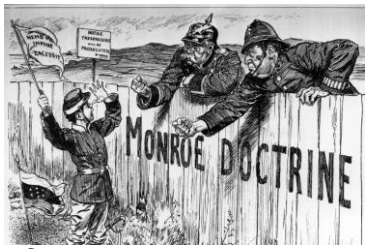

১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো মার্কিন স্বার্থে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন তাই মনরো ডকট্রিন নামে পরিচিত। এই নীতির মূল বক্তব্য ছিল মার্কিনিরা নিজ ভৌগোলিক সীমার বাইরে অন্যকোনো রাষ্ট্রকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং অন্যকোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

ডনরো ডকট্রিন

'ডনরো ডক্ট্রিন' মূলত Donald Trump এর পররাষ্ট্রনীতিকে বোঝাতে ব্যবহৃত একটি অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক শব্দ, যা ১৮২৩ সালের James Monroe ঘোষিত Monroe Doctrine এর আধুনিক সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মূল ধারণা হলো পশ্চিম গোলার্ধ বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায়-চীন ও রাশিয়ার মতো শক্তির প্রভাব কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যেখানে বন্দর, জ্বালানি, অবকাঠামো ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদকে জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে দেখা হয় এবং প্রয়োজনে সামরিক চাপ, নিষেধাজ্ঞা বা অর্থনৈতিক কৌশল প্রয়োগের কথাও উঠে আসে। মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন, পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করতে চাওয়া এবং ভেনেজুয়েলা ও কিউবায় সামরিক পদক্ষেপ সবই ডনরো ডক্ট্রিনের প্রয়োগ।

Smart Power

Hard Power এবং Soft Power উভয়ের মিশ্রণ হলো Smart Power। জোসেফ নাই এর মতে, "Smart power is neither hard nor soft, it is both" একটি রাষ্ট্রকে নিজের বশে আনতে সেই রাষ্ট্রকে একসাথে অর্থনৈতিক অবরোধ দেওয়া, মিলিটারি হুমকি দেওয়া, কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া, এই সবগুলোর সমন্বয়কে বলা হয় Smart Power। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ইরান ও উত্তর কোরিয়ার উপর এই Smart Power ব্যবহার করছে। অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে Soft Power এবং Hard Power এই দুটিকে একসাথে ব্যবহার করার নামই Smart Power।

Close Door Policy: কোনো একটি দেশকে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করার নীতি।

Open Door Policy: এটি এমন একটি অর্থনৈতিক নীতি যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে যে-কেউ, যে-কোনো দেশের, যে-কোনো পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে।

North-South Divide: শিল্পবিপ্লবের ফলে সম্পদ বণ্টনে সুস্পষ্ট বিভাজন তৈরি হয়। আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উঠতি পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করে দিনে দিনে আরও ধনী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ছোটোখাটো ব্যবসায়ী ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষ শিল্পবিপ্লবের জেরে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দিনে দিনে আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। এইভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে শিল্পোন্নয়নের হার ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় অনেকগুণ পিছিয়ে ছিল। ফলে বিশ্বে ধনসম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব এবং অনুন্নত বিশ্বের মধ্যে যে বৈষম্য তৈরি হয়, বিশেষজ্ঞরা সেই বৈষম্যকে 'উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

South-South Cooperation: উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক দক্ষিণের অধিবাসী ধরা হয়। এরকম একাধিক রাষ্ট্রের নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় South-South Cooperation। এটা দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক হতে পারে। যেমন: বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক (দ্বিপাক্ষিক), NAM (বহুপাক্ষিক)।

North-South dialogue: উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ সেই প্রক্রিয়াটিকে বোঝায় যার মাধ্যমে 'তৃতীয় বিশ্বের' উন্নয়নশীল এবং সদ্য স্বাধীন দেশগুলি মূলত এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায়, উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনায় নিযুক্ত করেছিল।

Indo Pacific Strategy (IPS):

২০০৭ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ভারতীয় সংসদে প্রথম 'Confluence of the Two Seas' শিরোনামে বক্তৃতায় 'Indo-Pacific' ধারণার প্রস্তাব দেন। এই ধারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মিলিত অঞ্চলকে একটি কৌশলগত থিয়েটার হিসেবে দেখা। পরবর্তীতে ট্রাম্প প্রশাসন এটিকে আনুষ্ঠানিক মার্কিন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এবং বাইডেন প্রশাসন এটিকে আরও পরিপক্কভাবে বাস্তবায়ন শুরু করে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাইডেন প্রশাসন 'Indo-Pacific Strategy of the United States' প্রকাশ করে, যার ৫টি মূল স্তম্ভ হলো:

১. একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলা;
২. আঞ্চলিক জোটকে জোরদার করা;
৩. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা;
৪. নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলা,
৫. আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সংকট মোকাবিলা।

বিভিন্ন প্রকার কূটনীতি

প্রতিরোধমূলক কূটনীতি (Preventive Diplomacy)

জাতিসংঘ সম্ভাব্য যুদ্ধরত জাতিসমূহের মাঝে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বা উভয়পক্ষের সাথে সরাসরি আলোচনা বৈঠকের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ নিরসন ও প্রতিরোধ করে থাকে। জাতিসংঘ প্রবর্তিত এ কূটনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি দেশের মাঝে যখন যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে, শান্তি প্রচেষ্টার সকল দিকই যখন স্তিমিত হয়ে পড়ে তখন জাতিসংঘ বিবদমান দুটি দেশের মাঝে যুদ্ধ প্রশমনে সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে। জাতিসংঘ প্রবর্তিত এ কূটনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধমূলক কূটনৈতিক ব্যবস্থা (Preventive Diplomacy) বলা হয়ে থাকে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার ইতিহাসে এ কূটনীতির বহু সফল দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছিল সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের এ প্রতিরোধ কূটনীতির সফল প্রয়োগ দেশ দুটির মাঝে স্থিতিশীল অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছিল।

সাইডলাইন কূটনীতি

বর্তমানে করিডোর বা সাইড লাইন কূটনীতি মূলত বিভিন্ন ধরনের কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে ঘটে থাকে। মূল আলোচনার বাইরে এ সমস্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের বিষয় আসতে পারে। মূল কনফারেন্সে যাবার আগে তাদের মনোভাবও এসব কূটনীতির দ্বারা জানা যায়।

Non-Aggression Pact (অনাক্রমণ চুক্তি)	দুই বা ততোধিক দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে না-বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করবে- এই মর্মে সম্পাদিত চুক্তি।
Nuncio (নানসিও)	রাষ্ট্রদূত মর্যাদার মিশন প্রধান যিনি ভ্যাটিকান সিটি এর প্রতিনিধিত্ব করেন।
Status quo	Status quo হলো একটি ল্যাটিন শব্দগুচ্ছ যার অর্থ বর্তমান অবস্থা, বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক বা সামরিক বিষয়ের ক্ষেত্রে। সমাজতাত্ত্বিক অর্থে, স্থিতাবস্থা বলতে সামাজিক কাঠামো বা মূল্যবোধের বর্তমান অবস্থাকে বোঝায়। Status quo রাষ্ট্রগুলো জিনিসগুলোকে যেমন আছে তেমন সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, যেখানে revisionist state আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জিনিসগুলো পরিবর্তন করতে চায়। পণ্ডিতরা যখন রাষ্ট্রগুলোকে সংশোধনবাদী বা স্থিতাবস্থা-অনুসন্ধানে শ্রেণিবদ্ধ করেন তখন তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়, যেমন যুদ্ধ এবং শান্তি।
কূটনৈতিক চরমপত্র (Diplomatic Ultimatum)	**কূটনৈতিক চরমপত্র (Diplomatic Ultimatum)** বলতে বোঝায় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে কঠোর সতর্কবার্তা বা দাবি জানানো, যেখানে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ বা ঘটনার পর **তাৎক্ষণিক, সুনির্দিষ্ট ও যাচাইযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়**। সাধারণত এতে বলা হয় যে দাবি পূরণ না করলে পরবর্তী সময়ে কূটনৈতিক বা অন্য ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। পাকিস্তান আফগানিস্তানের সরকারের কাছে অভিযোগ করেছে যে আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করে Tehrik-i-Taliban Pakistan (টিটিপি) এর সন্ত্রাসীরা হামলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। টিটিপি এর হামলায় ১১ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হওয়ার পর পাকিস্তান আফগানিস্তান-কে একটি **কূটনৈতিক চরমপত্র** পাঠায় এবং দাবি করে যে আফগান সরকার যেন অবিলম্বে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অভিবাসী (Immigrants)

আভিধানিক অর্থে কেউ বসবাসের উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে এক বছরের বেশি সময় থাকলে তাকে সাধারণ অর্থে অভিবাসী (Immigrant) বলা হয়। মানুষ বিভিন্ন কারণে অভিবাসী হতে পারে। যেমন- উন্নত জীবনের আশা, পড়ালেখা বা পারিবারিক কারণ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গৃহত্যাগ, পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি ৪ লাখ অভিবাসী আছে।

অভিবাসী সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

১. জাতিসংঘের নাগরিক অধিকার সনদ- ১৯৭৬
২. অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য বিলোপের জন্য ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে অভিবাসী সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন।
৩. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration নামে ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘে স্বাক্ষরিত অভিবাসী চুক্তি। ২৩ অনুচ্ছেদ সংবলিত এই চুক্তিটি অভিবাসী সংক্রান্ত শীর্ষ আইন।

শরণার্থী (Refugee)

জীবন বাঁচাতে নিজ দেশ ত্যাগকারীকে শরণার্থী (Refugee) বলে। ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুসারে শরণার্থী তিনি হবেন-

ক. যিনি সশস্ত্র লড়াই বা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে দেশ থেকে পালিয়ে যান।
খ. যিনি দেশ ত্যাগের পরে দেশে ফিরে গেলে জীবন বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।
গ. যিনি বর্ণবাদ, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হন।
ঘ. যিনি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে যেতে ভয়ে থাকেন।

১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী একজন শরণার্থী গৃহীত রাষ্ট্রে যেসব অধিকার পাবেন-

১. একজন শরণার্থীকে জীবন ও স্বাধীনতার হুমকির মুখে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না।
২. সামাজিক আবাসন সুবিধা পাবেন।
৩. সামাজিক কল্যাণমূলক সুবিধাগুলো পাবেন।
৪. সমাজে মিশে যাওয়ার অধিকার পাবেন।
৫. কাজের ব্যবস্থা পাবেন।